Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারিদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃরাফিয়া খাতুন

রোলঃ 228021607

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারিদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃরাফিয়া খাতুন
রোলঃ 228021607

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারিদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃরাফিয়া খাতুন, আইডিঃ 228021607 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারিদের আগমনের আসল উদ্দেশ্য ও আমাদের করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

রাফিয়া

(স্বাক্ষর)

মোছাঃরাফিয়া খাতুন

আইডিঃ 228021607

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, যেখানে ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে সমাজের সকল স্তরে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু এ দেশের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় রয়েছে যেখানে বিদেশি খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই প্রচেষ্টার পেছনে যে উদ্দেশ্যগুলো রয়েছে তা শুধু ধর্ম প্রচার নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গভীরভাবে বিশ্লেষণযোগ্য।

বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য, দুর্যোগ, এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি খৃষ্টান মিশনারীরা বিভিন্নভাবে তাদের কার্যক্রম বিস্তার করেছে। বিশেষত **১৯৭১** সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সাহায্য ও উন্নয়ন কর্মসূচির আড়ালে খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

তাদের এই তৎপরতা কখনো সরাসরি ধর্মান্তরকরণে, আবার কখনো শিক্ষার নামে, স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে, কিংবা দান-সহায়তার মোড়কে পরিচালিত হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে, গরিব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই কার্যক্রম অনেক বেশি সক্রিয়। বিশেষ করে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক ধর্মান্তর ঘটেছে।

এই থিসিসে আমরা বিশ্লেষণ করবো যে, খৃষ্টান মিশনারীদের বাংলাদেশে আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল এবং তাদের কৌশল কীভাবে দেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি এ-ও আলোচনা করা হবে যে, এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদের করণীয় কী হতে পারে — ধর্মীয় সচেতনতা, সামাজিক উদ্যোগ, শিক্ষার প্রসার ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার আলোকে।

1.1 ইহূদী-খৃষ্টানরা মুসলমানদের বন্ধু নয়:

আল্লাহ বলেন,
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلاَ نَصِيرٍ-

‘ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহর দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহর কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই’ (বাক্বারাহ ২/১২০)।

আয়াতে উল্লেখিত ‘মিল্লাত’ অর্থ দ্বীন ও শরী‘আত (কুরতুবী) এবং ‘ইল্ম’ অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ (ইবনু কাছীর)। অত্র আয়াতের উপরে ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, দাঊদ ইবনে আলী, আহমাদ প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেন,أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ ‘কাফেরগণ সকলেই এক মিল্লাত ভুক্ত’ (কুরতুবী)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ- ‘মুসলিম কোন কাফিরকে ওয়ারিছ বানায় না বা কোন কাফির কোন মুসলিমকে ওয়ারিছ বানায় না’।[4] তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছিল কেবলমাত্র ‘ইসলাম’-এর কারণে। সেকারণ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে জানিয়ে দিলেন যে, তারা কখনোই তার উপরে খুশী হবে না, যতক্ষণ না তিনি তাদের মিল্লাতভুক্ত হবেন। অতঃপর তিনি রাসূলকে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিলেন’ (কুরতুবী)।

কুরআন অবতরণের পরে তাওরাত-ইঞ্জীল মানসূখ হয়ে গেছে। এসবের কোন হুকুম এখন আর কারু জন্য পালনযোগ্য নয়। মূল তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোন অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। পুরাতন ও নতুন সমাচার (Old & New Testament) বলে প্রচলিত বই সমূহ তাদের নিজেদের রচিত। বিশ্ব মানবতাকে তাই এখন কেবলমাত্র কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলতে হবে। ইমাম শাওকানী বলেন, ‘ইহূদী-নাছারাদের শরী‘আত এখন মানসূখ বা হুকুম রহিত। তাদের কিতাব সমূহ পরিবর্তিত হয়ে গেছে’। এখন তাদের কিতাবের অনুসরণ করা অর্থ তাদের খোশখেয়াল সমূহের অনুসরণ করা’। তিনি বলেন, ‘এই আয়াতগুলির মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য হুঁশিয়ারী ও সাবধানবাণী রয়েছে যে, তারা যেন ইহূদী-নাছারা বা কোন মুশরিক ও বিদ‘আতী দলসমূহের পাতা ফাঁদে পা না দেয় বা তাদের সন্তুষ্টি ও সমর্থন কামনা না করে।

তারা যেন কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানসমূহ ছেড়ে এইসব দলের চোখ ধাঁধানো ও দুষ্ট মতবাদ সমূহের পিছনে না ছোটে' (শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর)।

সৈয়দ রশীদ রিযা বলেন, অত্র আয়াতে 'আহলুল কিতাব' না বলে 'ইয়াহূদ' ও 'নাছারা' বলার তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুমিন সম্প্রদায়ের সাথে তাদের শত্রুতা মূলতঃ কিতাবের কারণে ছিল না। কেননা তাদের কিতাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে বলেনি। বরং তাদের এই দুশমনী ছিল স্রেফ রাজনৈতিক ও দলীয় হিংসার কারণে। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে নির্দেশ দিচ্ছেন তারা যেন ঈমানদারগণের বিরুদ্ধে ইহূদী-নাছারাকে তাদের আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এটা করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের দলের বাইরে চলে যাবে। আল্লাহ ও রাসূল তাদের থেকে মুক্ত'।[5]

1.2 ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে এসে খ্রিস্টানদের যা বলবেন

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় পুনরায় আগমন করবেন। এটি কুরআন এবং বহু সহিহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি বিশুদ্ধ আক্বীদা। তাঁর এই আগমন কোনো নতুন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়; বরং তিনি আসবেন পূর্ববর্তী ভুল ধারণার সংশোধন এবং সত্যের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য।

ঈসা (আঃ) খ্রিস্টানদের ভুল বিশ্বাসের প্রতিবাদ জানাবেন

খ্রিস্টান ধর্মে হযরত ঈসা (আঃ)-কে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। অথচ তিনি কখনো নিজেকে উপাস্য বলেননি, বরং আল্লাহর একজন প্রেরিত রাসূল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেন:

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ...

"আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়ম–পুত্র ঈসা! তুমি কি মানুষদের বলেছিলে, 'আমাকে ও আমার মাকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ করো?' তিনি বলবেন, 'আপনি পবিত্র! আমার পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয় যা বলা আমার জন্য সঠিক নয়।'"
— সূরা আল-মায়িদা: **১১৬**

এই আয়াত অনুসারে, কিয়ামতের দিন ঈসা (আঃ) স্পষ্ট করে বলবেন তিনি কখনো নিজেকে উপাস্য হিসেবে দাবী করেননি। তিনি কেবল বলেছিলেন:

اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

“তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, যিনি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু।”

ঈসা (আঃ)-এর ভূমিকা হবে সাক্ষ্য প্রদান ও সংশোধনের

সহীহ হাদীসসমূহে ঈসা (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

খ্রিস্টানদের সামনে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি কখনো ঈশ্বর ছিলেন না।

ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করবেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর শরী‘আত অনুযায়ী চলবেন।

হাদীসে বলা হয়েছে:

> “সে সময় ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ) নাজিল হবেন... এবং তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজিয়া উঠিয়ে দেবেন এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।”
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৪৪৮

নতুন শরী‘আত নয়, বরং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী হিসেবে আগমন

ঈসা (আঃ) কোনো নতুন শরী‘আত নিয়ে আসবেন না। বরং তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবেন। এতে স্পষ্ট হয়ে যায়, ঈসা (আঃ) পুনরায় আগমন করে খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তি দূর করবেন এবং ইসলামের সত্যতা তুলে ধরবেন।

1.3 শুধু ইহূদী-খ্রিষ্টান নয়,বরং কাফিরদের সাথেও বন্ধুত্ব গড়া নিষিদ্ধ

শুধু ইহূদী-খৃষ্টান নয়, বরং কোন কাফেরের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে নিষেধ করে বলা হচ্ছে, لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاة، ‘মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তোমরা যদি তাদের থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর’ (আলে ইমরান ৩/২৮)। দুনিয়াবী সম্মান লাভের জন্য যাতে এটা না করা হয়, সেজন্য বলা হয়েছে, الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ‘যারা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান কামনা করে? জেনে রেখো সর্বপ্রকার ইযযতের মালিকানা স্রেফ আল্লাহর’ (নিসা ৪/১৩৯)। এমনকি নিজের বাপ-ভাই যদি ঈমানের উপরে কুফরীকে ভালবাসে, তবে তাদেরকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না (তওবাহ ৯/২৩)। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ করে কোন মুসলিম দেশের জাতীয় ও পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্র আয়াতগুলি স্থায়ী মূলনীতি স্বরূপ।

অধ্যায় ২: ইহূদী-খ্রিষ্টান

2.1 ইহূদী-খ্রিষ্টান পরিচিতি:

হযরত ইবরাহীমের প্রথমা স্ত্রী সারার গর্ভে ইসহাক্ব-এর জন্ম হয়। তাঁর বংশধরগণ ‘বনু ইসরাঈল’ নামে পরিচিত। এই বংশে হাযার হাযার নবীর জন্ম হয়। এদের ক্বিবলা ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস। আহলে কিতাবদের মধ্যে এই দলই বড়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নবী হলেন মূসা (আঃ)। তাঁর নিকটে ‘তাওরাত’ নাযিল হয়। যা ছিল মূলতঃ হালাল-হারাম ইত্যাদি ব্যবহারিক বিধি-বিধান সম্বলিত গ্রন্থ। তাঁর অনুসারীগণ ‘ইয়াহূদ’ নামে পরিচিত। তারপরে শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন ঈসা (আঃ)। ইনি হযরত দাঊদ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর নিকটে ‘ইঞ্জীল’ নাযিল হয়। এটি ছিল মূলতঃ পরকালীন মুক্তির সুসংবাদবাহী ও উপদেশমূলক গ্রন্থ। তাঁর অনুসারীগণ ‘নাছারা নামে খ্যাত। এঁদের ক্বিবলা ছিল কা‘বাগৃহ। ইহূদীদের প্রতিপক্ষ ছিল ফেরাঊন, হামান প্রমুখ কাফের নেতাগণ এবং নাছারাদের প্রতিপক্ষ ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিকগণ। ইঞ্জীলে যেহেতু তাওরাতের বিধি-বিধানের তেমন কোন পরিবর্তিত ছিল না, সেকারণ তারা ঈসা (আঃ)-কে মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হিসাবে গণ্য করত। যদিও তারা নিজেরা তাওরাতের বিধি-বিধান সমূহকে পরিবর্তন করেছে। যেমন শনিবারের সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনকে রবিবার করা, শূকরের গোশতকে হালাল করা ইত্যাদি। তবে একটি বিষয়ে উভয় দল একমত ছিল যে, শেষ নবী মুহাম্মাদ সত্ত্বর আগমন করবেন এবং তাঁর নাম, চেহারা, জন্মস্থান সবই তারা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে জানত। সেকারণ তাদের পূর্ব পুরুষগণ শেষনবীকে সাহায্য করার জন্য সিরিয়া থেকে হিজরত করে মদীনার নিকটবর্তী এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেন ও বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু যখন শেষ নবীর আবির্ভাব হ’ল এবং তিনি হিজরত করে মদীনায় এলেন,তখন তারা তাঁকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারলেও বংশীয় অহমিকা মাথাচাড়া দেওয়ায় তাঁকে সহযোগিতা দূরে থাক, বরং সবরকমের শত্রুতায় লিপ্ত হ’ল। উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদ-নাছারাগণ পরস্পরের শত্রু ছিল এবং প্রত্যেকেই প্রতিপক্ষ দলকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে দাবী করত (বাক্বারাহ ২/১১৩)। শেষ নবী এসে তাদেরকে বললেন, لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ‘তোমরা কিছুর উপরে নেই, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে প্রতিষ্ঠিত করবে’ (মায়েদাহ ৬৮)। যেহেতু তাওরাত ও ইঞ্জীল মানতে গেলে কুরআনকে মানতে বাধ্য হতে হয়, তাই তারা সবকিছুকে অস্বীকার করল ও শেষ নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হ’ল।[16]

2.2 ইহূদী-খৃষ্টানদের ইতিহাস চির কপটতার ইতিহাস :

(১) রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র : হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বনু নাযীর, বনু কুরায়যা প্রমুখ ইহূদী-নাছারা গোত্রসমূহের সাথে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, যা ইতিহাসে 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। উক্ত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কেউ কারু বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। বরং পরস্পরে মিলে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুনাফিকের প্ররোচনায় ও কাফিরদের আহবানে তাদের গোত্রে দ্বীন প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৭০ জনের একটি প্রচারকদল পাঠালে তারা সকলেই মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের শিকার হন। ইতিহাসে যা বি'রে মা'ঊনার ঘটনা বলে প্রসিদ্ধ। উক্ত হত্যাকান্ড থেকে বেঁচে যাওয়া মাত্র একজন ছাহাবী আমর বিন উমাইয়া যামীরী মদীনায় ফেরার পথে শত্রুপক্ষীয় দু'জন কাফেরকে পেয়ে হত্যা করে ফেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এ দু'জন ছিল বনু আমের গোত্রের লোক, যাদের সঙ্গে রাসূলুললাহ (ছাঃ)-এর শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু সেকথা উক্ত ছাহাবী জানতেন না। তাদের সাথে বনু নাযীরেরও শান্তিচুক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ঐ দুই নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য আদায়ের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার পরে মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে বনু নাযীর ইহূদী গোত্রে গমন করেন। হযরত আবুবকর, ওমর, আলী প্রমুখ ছাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। বনু নাযীর গোত্র তাঁদেরকে সসম্মানে একটি প্রাচীরের ছায়ায় বসতে দিল এবং গোত্রের লোকদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে এনে তাঁকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে দুষ্টবুদ্ধি জেগে উঠল এবং এই সুযোগে রাসূলকে হত্যা করার ফন্দি অাঁটলো এবং বললঃ কে আছ এই লোকটিকে হত্যা করে এর হাত থেকে আমাদের শান্তি দিতে পার? তখন আমর বিন জাহহাশ বিন কা'ব নামক জনৈক ইহূদী সঙ্গে সঙ্গে রাযী হয়ে গেল এবং বড় একটি পাথর তাঁদের উপরে ফেলে মারার জন্য প্রাচীরের উপরে উঠে গেল। অহি-র মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন এবং চুক্তিভঙ্গের অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অবশ্য তিনি তাদেরকে অস্ত্র ব্যতীত কেবল এক উট বোঝাই মাল-সামান নিয়ে তাদের ইচ্ছামত স্থানে চলে যাবার জন্য ১০ দিনের সুযোগ দিলেন। কিন্তু মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীদের প্ররোচনায় তারা তাদের মযবূত প্রাচীর বেষ্টিত দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে অবস্থান নেয়। কিন্তু পরিশেষে মুনাফিকদের নিকট থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ায় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর চূড়ান্ত নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ায় তারা ২১ দিন পরে দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে আসে এবং রাসূলের নির্দেশ মতে তারা أرض الحشر অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন মানুষের জমা হওয়ার স্থান শাম দেশ (সিরিয়া) অভিমুখে চলে যায়। হুয়াই বিন আখত্বাব, আব্দুল্লাহ বিন আবিল হুক্বাইক্ব, কিনানা বিন রাবী' প্রমুখ ইহূদী নেতৃবৃন্দ ও তাদের সাথীরা খায়বারে বসতি স্থাপন করেন। কেউ কেউ শামের অন্যস্থানে চলে যায়। ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক

বলেন যে, এই ঘটনা ওহোদ যুদ্ধের পরে ৪র্থ হিজরীতে এবং বি'রে মা'ঊনার মর্মান্তিক ঘটনার পরে সংঘটিত হয়। কুরতুবী এ মত সমর্থন করেন। তবে বুখারী যুহরীর মাধ্যমে ওরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনা ২য় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধের ছয় মাস পরে এবং ওহোদে পূর্বে সংঘটিত হয়'।[6] মদীনা তথা আরব উপদ্বীপ থেকে তাদের এই উচ্ছেদ ঘটনাকে কুরআনে أول الحشر বা 'প্রথম একত্রিত উচ্ছেদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[7]

তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে খায়বরে এটা ছিল প্রথম উচ্ছেদ। দ্বিতীয় উচ্ছেদ ঘটে ওমর ফারূকের সময়ে তাদের কুফরী ও ওয়াদা ভঙ্গের কারণে খায়বর থেকে নাজদ ও আযরি'আতে। কেউ কেউ বলেন, যেরুযালেমের আরীহা ও তাইমাতে'।[8] মূলতঃ হারূণ (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত এই গোত্র সিরিয়া থেকে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল শেষনবীর আগমনের আশায়। কিন্তু শেষনবী বনু ইসরাঈল না হয়ে বনু ইসমাঈল হওয়ায় তারা তাঁকে চিনতে পেরেও অস্বীকার করে স্রেফ বংশীয় অহংকারের যিদে পড়ে (ঐ)।

(২) চুক্তি ভঙ্গ : মদীনার বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা প্রভৃতি ইহূদী-নাছারা গোত্রগুলি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কৃত চুক্তির প্রতি অনুগত ছিল। বরং বদর যুদেধ অভাবিত বিজয় লাভের ফলে তাদের মধ্যে রাসূলেল প্রতি আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ওহোদ যুদ্ধ বিপর্যয়ের ফলে ও মুশরিকদের অব্যাহত প্ররোচনার ফলে তাদের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গের প্রবণতা দানা বেঁধে ওঠে এবং তাদের অন্যতম নেতা কা'ব বিন আশরাফ ৪০ জন ইহূদীকে সাথে নিয়ে গোপনে মক্কায় চলে যায় ও সেখানে কুরায়েশ নেতাদের নিয়ে কা'বা গৃহের গেলাফ স্পর্শ করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।[9]

(৩) শত্রুর সহযোগিতা : ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যা গোত্র মদীনা আক্রমণকারী কাফের দলসমূহের সাথে সহযোগিতা করে। ফলে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হয় ও বাকীদের বন্দী করা হয় ও মাল-সম্পদ সবকিছু মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়।[10]

ইহূদী-খৃষ্টানদের এই মুসলিম বিদ্বেষের ইতিহাস রাসূলের যুগ থেকে এ যাবত জারি আছে। যদিও সে যুগে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর মত সরলপ্রাণ খৃষ্টান নরপতি ছিলেন। যিনি শুধু মুসলমানদের সাহায্য করেননি; বরং গোপনে ইসলাম কবুল করেছিলেন বলে হাদীছে

বর্ণিত হয়েছে। অমনিভাবে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও বহু ইহূদী-খৃষ্টান রয়েছেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি সহানুভূতিশীল সে যুগেও ছিলেন, এ যুগেও আছেন। বনু নাযীরকে যখন মদীনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তখনও তাদের মধ্যকার দু'জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে নিরাপদে মদীনায় থেকে যান। আজও যখন ফিলিস্তীনের অসহায় মুসলমান নর-নারী ও শিশুদের উপরে আমেরিকা ও বৃটেনের সহায়তায় বর্বর ইহূদী শাসকরা নির্মম হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তখনও সেখানে বহু শান্তিপ্রিয় ইহূদী আরব এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতবিাদ মিছিল করে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে ও পেন্টাগনে আত্মঘাতি বিমান হামলা চালানোর প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধবাজ বুশ প্রশাসন যখন ওসামা বিন লাদেনকে সন্দেহ করে ভূখা-নাঙ্গা আফগান জনগণের উপর ভয়ংকর হামলা পরিচালনার হুমকি দিচ্ছে এবং আমেরিকার সরকারী ও বিরোধীদল সর্বসম্মতিক্রমে এই হামলা পরিকল্পনা অনুমোদন করছে, তখনও দেখা যাচ্ছে নিউইয়র্ক সিটিতে হাযার হাযার খৃষ্টান ছাত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে প্লাকার্ড বহন করে মিছিল করছে। এধরনের ব্যতিক্রম চিরকাল ছিল আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু সাধারণভাবে সকল ইহূদী-খৃষ্টান মুসলিম উম্মাহর শত্রু। বিশেষ করে ইহূদীরাই সবচেয়ে বড় শত্রু। ইবনু কাছীর বলেন, এর কারণ হ'ল এই যে, এদের ইসলাম বিদ্বেষ হ'ল হঠকারিতাসূলভ। এরা ইসলাম ও শেষ নবীকে হক জেনেই অস্বীকার করে কেবল বংশীয় অহংকার বশে। তারা বনী ইসরাঈলের বহু নবীকে হত্যা করেছে। অবশেষে আখেরী নবীকে কয়েকবার হত্যা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছে ও জাদু করেছে'। ইহূদীদের চাইতে নাছারাগণ মুসলমানদের কিছুটা নিকটবর্তী হবার কারণ এই যে, তারা নিজেদেরকে ঈসা (আঃ)-এর আনীত ইঞ্জীল কিতাবের অনুসারী বলে দাবী করে। তাছাড়া নাছরাদের মধ্যে বহু দুনিয়াত্যাগী সরলপ্রাণ ধর্মযাজক আছেন, যাদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে'।[11]

(৪) খাদ্যে বিষপ্রয়োগ : খায়বরের ইহূদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মেহমান হিসাবে দা'ওয়াত দিয়ে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে।[12]

(৫) চূলে জাদু : মুনাফিক লাবীদ বিন আ'ছাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চূলে জাদু করে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা করে।[13]

(৬) ক্রুসেড ঘোষণা : ১০৯৮-১২৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ব্যাপী ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে খৃষ্টান-মুসলিম সম্ভাব দূর হয়ে যায়। অবশেষে ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর হাতে গোটা ইউরোপীয়

খৃষ্টান শক্তি চরমভাবে মার খায়। এই পরাজয়ের গ্লানি তারা কখনো ভুলেনি। তাই ১ম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে যখন যেরুযালেম মুসলমানদের হাত থেকে বৃটিশ খৃষ্টানদের হাতে চলে যায়, সেদিন যেরুযালেমের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে বৃটিশ জেনারেল এলেনবাই বলেছিল "Today ends the crusade" 'আজকে ক্রুসেড শেষ হ'ল'। ১৯২০ সালে ফরাসী জেনারেল গুরিয়ান একইভাবে সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবীর কবরে পা রেখে বলে ওঠেন, "We have come back Saladin" 'ছালাহুদ্দীন আমরা আবার ফিরে এসেছি'।

(৭) অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্টা: রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহূদীদেরকে খৃষ্টানরাই ফিলিস্তীনে জোরপূর্বক বসতি স্থাপনে বাধ্য করে এবং তাদেরকে সামনে রেখে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তারিখে অবৈধ 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে এ যাবত তাদেরকে দিয়েই দৈনিক মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের উপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

(৮) চির অভিশপ্ত : সূরায়ে ফাতিহাতে বর্ণিত 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) ও 'যা-ল্লীন' (পথভ্রষ্ট)-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করেন যে, إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَإِنَّ الضَّالِّينَ النَّصَارَى 'অভিশপ্ত হ'ল ইহূদীরা এবং পথভ্রষ্ট হ'ল নাছারাগণ' (সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৬৩)। মুসলিম মুফাসসিরগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, উভয় দলই আল্লাহর গযব ও লা'নতপ্রাপ্ত। তবে উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এই যে, ইহূদীরা ইসলাম-এর সত্যতা উপলব্ধি করেও তা যিদ ও অহংকারবশে প্রত্যাখ্যান করে (কারণ শেষ নবী (ছাঃ) তাদের বংশে জন্মগ্রহণ না করে ইসমাঈলের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন)। পক্ষান্তরে নাছারাগণের নিকটে ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা ভ্রষ্টতার অন্ধকারে পথ হাতড়িয়ে ফিরছে। আল্লাহ নিজেই তাদের এ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل 'তারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সঠিক রাস্তা হতে পথভ্রষ্ট হয়েছে' (মায়েদাহ ৭৭)।

2.3 বিভিন্ন ফিরকা সমূহ:

ইয়াহূদ-নাছারাগণ অসংখ্য দলে বিভক্ত। হাদীছে ৭২ ফেরকা বলা হলেও তার অর্থ হল অসংখ্য। যদিও মুসলমানদের সাথে শত্রুতার বেলায় তারা সবাই এক। আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে বনু ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় দল ইহূদীরা এখন বিশ্বের অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে এবং অপরের দয়ার ভিখারী হয়ে আমেরিকা ও ইসরাঈলে কোন রকমে টিকে আছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী খৃষ্টানরা অহংকারে বুঁদ হয়ে আসন্ন ধ্বংসের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

আধুনিককালের খৃষ্টানরা প্রধানত: তিনভাগে বিভক্ত: ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্ট। এরা সবাই যীশু খৃষ্টের অনুসারী হওয়ার দাবীদার। খৃষ্টান ধর্ম কোন বিশ্বধর্ম ছিল না। কেননা শেষনবী ব্যতীত সকল নবীই ছিলেন গোত্রীয় নবী'।[17] ঈসা (আঃ) কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের আত্মশুদ্ধি ও পাপমুক্তির জন্য দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। এই ধর্মের কোন রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক রূপ ছিল না। ৩০৬ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কনষ্টান্টাইন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'নিকিয়া' (Nicaea) অধিবেশনে রোমানদের মূর্তিপূজা ত্রিত্ববাদের আকারে এ ধর্মে ঢুকে পড়ে ও ত্রিত্ববাদের বুনিয়াদ স্বীকৃত হয়। ৫২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম গোটা রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গোটা ইউরোপ এই ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। যদিও বহু খৃষ্টান এতে বিশ্বাসী নয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের অরচেষ্টার হলিক্রস কলেজের ধর্ম বিষয়ক বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ জন, এল, ইসপোসিটো বলেন, ...একমাত্র কুরআনই আসমানী কেতাব সমূহের মধ্যে অবিকৃত রয়েছে। ...বহু খৃষ্টানই আল্লাহর ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে না'।[18] সম্রাট কনষ্টান্টাইনের আমলেই ইউরোপকে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে ভাগ করা হয়। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনোপল বা আজকের ইস্তাম্বুল। এ অঞ্চলের ধর্মীয় প্রধানকে বলা হয়, 'পেত্রিয়ার্ক'। ইউরোপের বলকান রাজ্যগুলি, গ্রীস, মধ্য এশিয়া, মিসর ও আবিসিনিয়া হয় পশ্চিমাঞ্চল। যার রাজধানী হয় রোম এবং ধর্মীয় প্রধানকে বলা হয় 'পোপ'। শুরু হয় দু'অংশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিবাদ। চলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শত শত বছর ধরে। বর্তমানে বিশ্ব ক্যাথলিকদের প্রধান কেন্দ্র। পোপের কর্তৃত্ব ও মতবাদ অস্বীকার করেন পেত্রিয়ার্ক। তাই পোপ-পেত্রিয়ার্ক দ্বন্দ্ব খৃষ্টধর্মের আদিকাল থেকেই চলে আসছে।

১২৫৪ খৃষ্টাব্দে পেত্রিয়ার্ক মিখাইল কারোনারিউস-এর আমলে জন্ম নেয় গ্রীক 'অর্থোডক্স চার্চ'। যার প্রধান কেন্দ্র হয় কনস্টান্টিনোপল। সংস্কারক মার্টিন লুথার প্রথমে ছিলেন ক্যাথলিক ও

স্বধর্মে সুপন্ডিত। পরে রোমান চার্চ ও পোপ-পাদ্রীদের অপকর্ম ও পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি যখন সংগ্রাম শুরু করেন, তখন পোপ জার্মান সম্রাটের সাহায্যে তার নাগরিকত্ব হরণের ব্যবস্থা করেন। লুথারের অনুসারীরা এই আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তীব্র প্রতিবাদ (Protest) জানায়। ফলে ১৫২৯ সালে জন্ম হয় 'প্রটেষ্ট্যান্ট' সম্প্রদায়ের। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী ও চতুর্থ এডওয়ার্ডের এই ধর্মমত গ্রহণ করায় প্রটেষ্ট্যান্ট মতবাদ ক্যাথলিক মতবাদের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে খৃষ্টানরা আরো বহু দলে বিভক্ত হয়। তাদের এক দল অন্য দলকে যথার্থ খৃষ্টান বলে বিশ্বাস করে না। ক্যাথলিক ধর্মমতে বিশ্বাসীর জন্য অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্টদের সাথে বিয়ে-শাদী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কিন্তু মজার কথা হ'ল এই যে, দুনিয়ার সব জায়গায় অন্য ধর্মাবলম্বী বিশেষ করে মুসলমানদের মুকাবিলায় এরা পরস্পরের সহযোগী।

অধ্যায় ৩: খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের ইতিহাস (বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত)

বিশ্বের ইতিহাসে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রম একটি সুদীর্ঘ ও প্রভাবশালী অধ্যায়। এটি শুধু ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না, বরং এর সঙ্গে জড়িত ছিল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারের নীতিমালা। ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একে বিশ্বব্যাপী বিস্তারের প্রয়াস শুরু হয়। সময়ের পরিক্রমায়, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই কার্যক্রম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে।

৩.১ ইউরোপে মিশনারি আন্দোলনের সূত্রপাত

খ্রিস্টান মিশনারি আন্দোলনের সূচনা হয় মূলত খ্রিস্টধর্মের জন্মভূমি জেরুজালেম থেকে। তবে এর সংগঠিত ও ব্যাপক রূপ দেখা যায় মধ্যযুগে, বিশেষ করে **১১শ** শতকে 'ক্রুসেড' (Crusades) নামে পরিচিত যুদ্ধগুলোর মাধ্যমে। ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলিম অধিকৃত পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারের নামে যুদ্ধ শুরু করলেও এই সময়টিই ছিল ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক সংগঠিত যুগ।

১৬শ শতকে প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনের (Protestant Reformation) ফলে মিশনারি কার্যক্রমে নতুন গতি আসে। তখন ধর্মীয় বিভাজনের কারণে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টরা আলাদা আলাদাভাবে ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করে। বিভিন্ন ধর্মীয় সংঘ যেমন "জেসুইট অর্ডার" (Jesuit Order) ধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৩.২ উপনিবেশবাদের সঙ্গে সম্পর্ক

খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের সঙ্গে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। ইউরোপ যখন আফ্রিকা, এশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন অংশে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন সাথে সাথে খ্রিস্টান মিশনারিরাও এসব অঞ্চলে প্রবেশ করে। এটি অনেক ক্ষেত্রে ছিল কৌশলগত; সামরিক বা রাজনৈতিক দখলের আগে মিশনারিরা স্থানীয় জনগণের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করত, ধর্ম প্রচারের আড়ালে সাংস্কৃতিক ও মানসিক দাসত্ব কায়েম করত।

বিশেষ করে ব্রিটিশ, ফরাসি, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ উপনিবেশবাদীরা ধর্ম প্রচারকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। মিশনারিরা বিদ্যালয়,

হাসপাতাল, পত্রিকা, বইপুস্তক এবং অনুবাদ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে পশ্চিমা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত।

৩.৩ ধর্ম প্রচারে ব্যবহৃত কৌশল

খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্ম প্রচারে যে কৌশলগুলো ব্যবহার করেছে, তা অত্যন্ত সুনিপুণ এবং বহুস্তরবিশিষ্ট। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৌশলগুলো হলো:

1. দাতব্য কাজ ও অর্থনৈতিক সাহায্য: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা সরবরাহের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন এবং পরে ধর্মান্তরের পথে উদ্বুদ্ধ করা।

2. শিক্ষা ও ভাষার ব্যবহার: স্থানীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদ, খ্রিস্টান ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ছিল তাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের পন্থা।

3. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা: আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে মিশনারিরা স্থানীয় মানুষের দুর্দশায় পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বস্ততা অর্জন করত।

4. মানসিক প্রভাব ও সহানুভূতির ব্যবহার: যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মিশনারিরা সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এ সময় তারা মানুষের দুর্বলতা ও আবেগকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

5. নারী ও শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানানো: মিশনারিরা জানত যে পরিবারে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব রাখে, তাই তাদেরকেই প্রথমে সাহায্য, প্রশিক্ষণ ও কাজের সুযোগ দিয়ে ধর্মান্তরের দিকে ধাবিত করত।

অধ্যায় ৪: উপমহাদেশে মিশনারিদের আগমন ও কার্যক্রম

উপমহাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন একটি ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের দিকচিহ্ন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রায় সমান্তরালে এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। উপমহাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধর্মীয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের কার্যক্রম একটি সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদী ধর্মান্তর নীতির অংশ ছিল। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি তারা শিক্ষা, চিকিৎসা ও দাতব্য কাজের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

৪.১ ব্রিটিশ রাজের মদদে মিশনারিদের কার্যক্রম

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমদিকে ধর্মীয় কার্যক্রম থেকে নিজেদের দূরে রাখলেও, **১৮১৩** সালের চার্টার অ্যাক্টের পর মিশনারিদের ভারতবর্ষে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর থেকে মিশনারিদের উপস্থিতি এক নতুন মাত্রায় পৌঁছে যায়।

উইলিয়াম কেরি (William Carey) ছিলেন উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকারের মদদপুষ্ট অন্যতম প্রধান মিশনারি। তিনি **১৭৯৩** সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন।

ব্রিটিশ প্রশাসন মিশনারিদের জন্য জমি বরাদ্দ, অর্থায়ন, ভ্রমণ সুবিধা এবং প্রভাবশালী অবস্থান নিশ্চিত করে। তাদের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং ছাপাখানার মাধ্যমে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়ানোর পথ সুগম হয়।

৪.২ ধর্মীয় ও ভাষাগত প্রভাব

খ্রিস্টান মিশনারিরা শুধু ধর্ম প্রচারে সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা ভাষা ও সাহিত্যকেও ব্যবহার করেছে একটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে।

বাংলা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করে তারা স্থানীয় জনগণের কাছে ধর্মগ্রন্থ সহজলভ্য করে তোলে। উইলিয়াম কেরি কর্তৃক অনূদিত বাইবেল ও অন্যান্য খ্রিস্টান সাহিত্যে ইসলাম ও

হিন্দুধর্মের শব্দাবলি বাদ দিয়ে সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ চয়ন করা হয়, যাতে মুসলিম জনগণের ভাষা ও সাহিত্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায়।

তারা প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দাবলি বাদ দিয়ে শব্দভাণ্ডার সংস্কৃতমুখী করে তোলে। এর ফলে ভাষাগতভাবে মুসলমানদের প্রান্তিক করার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

স্কুল ও কলেজে খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক পাঠ্যক্রম চালু করে নতুন প্রজন্মকে পশ্চিমা চিন্তাভাবনায় শিক্ষিত করার পাঁয়তারা করা হয়।

৪.৩ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

মিশনারিদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা ছিল মূল টার্গেট জনগোষ্ঠী। কারণ ইসলাম ছিল উপমহাদেশে একটি শক্তিশালী ও সাংগঠনিক ধর্মীয় শক্তি, যা খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হতো।

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন, কুরআন ও হাদীসের প্রতি অনুরাগ এবং আলেম-উলামাদের নেতৃত্ব মিশনারিদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।

তারা মুসলমানদের "প্রতিবন্ধক গোষ্ঠী" মনে করে, প্রথমে হিন্দু ও আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মান্তরে মনোযোগ দেয়, পরে মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, প্রান্তিক ও অশিক্ষিত শ্রেণির মানুষের ওপর লক্ষ্য স্থির করে।

মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে মিশনারিরা নানা ধরনের অপপ্রচার চালায়। মুসলিম ধর্মগুরুরা এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে জবাব দিতে শুরু করেন। এ সময় মুনশী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ মুসলিম চিন্তাবিদদের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ৫: উইলিয়াম কেরির আগমন ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রভাব

উইলিয়াম কেরি (William Carey) ছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারি ও শিক্ষাবিদ, যিনি **১৭৯৩** সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি শুধু একজন ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না, বরং একজন ভাষাবিদ, শিক্ষানুরাগী এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কারিগর হিসেবে কাজ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রভাব ছিল সুগভীর—যা একদিকে যেমন শিক্ষা ও মুদ্রণ প্রযুক্তির প্রসারে অবদান রেখেছে, অন্যদিকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫.১ বাংলা অনুবাদ ও অভিধান রচনা

উইলিয়াম কেরির বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর ধর্মপ্রচারের কৌশলগত অংশ।

তিনি বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেন, যাতে খ্রিস্টান ধর্মীয় বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছানো যায়। **১৮০১** সালে তাঁর অনূদিত "বঙ্গানুবাদিত বাইবেল" প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়।

তিনি রচনা করেন "A Dictionary of the Bengali Language" যা ছিল বাংলা ভাষার প্রথম প্রামাণ্য অভিধানগুলোর একটি। তবে এই অভিধান রচনায় আরবি ও ফারসি উৎস শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃতঘেঁষা শব্দভাণ্ডার ব্যবহার করা হয়।

তাঁর কাজকে অনেক গবেষক "ইসলামবিরোধী ভাষাগত অভিযানের সূচনা" হিসেবে দেখেন, যার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে মুসলিম প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫.২ ধর্মীয় সাহিত্য ও প্রকাশনা

কেরি বাংলা ভাষায় ব্যাপক ধর্মীয় সাহিত্য প্রকাশ করেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার।

তিনি সেরামপুর মিশনে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন, যেখান থেকে খ্রিস্টান ধর্মীয় পুস্তক, বাইবেল, পুস্তিকা, নৈতিক শিক্ষার বই ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এটি উপমহাদেশে প্রথম বাংলা ছাপাখানার মধ্যে অন্যতম।

তাঁর প্রকাশিত পুস্তিকাগুলোতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য সমালোচনা ছিল। তিনি 'মুসলমান' শব্দটির বিরোধিতা করে প্রচার করতেন যে মুসলমানদের ধর্ম একটি "ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি"।

অনেক গবেষক উল্লেখ করেন যে এই সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে কেরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে খ্রিস্টান মতাদর্শ ঢুকিয়ে দেন, যা মুসলমানদের ভাষাগত ও ধর্মীয় পরিচয়ে প্রভাব ফেলেছিল।

৫.৩ বাংলা ভাষায় হিন্দু ভাবধারার প্রচার

কেরির বাংলা অনুবাদ ও সাহিত্যচর্চায় ইসলামিক প্রভাবযুক্ত শব্দাবলিকে বাদ দিয়ে, সংস্কৃত ও হিন্দু ভাবধারাসমৃদ্ধ ভাষা ব্যবহার ছিল সুস্পষ্ট।

বাংলা সাহিত্যে আগে প্রচলিত আরবি-ফারসি ও ইসলামি শব্দাবলিকে অপ্রাসঙ্গিক বা অশোভন মনে করে তিনি সেগুলোর পরিবর্তে সংস্কৃতমূলক শব্দের ব্যবহার প্রচলন করেন।

কেরির প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা এক ধরনের হিন্দু-জাত ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে, যা মুসলমানদের জন্য ভাষাগতভাবে একধরনের আত্মবিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এই ধারা পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায়ও প্রভাব ফেলে—যেখানে মুসলিম সমাজের উপরে সাংস্কৃতিক বিরোধিতা প্রতিফলিত হয়।

অধ্যায় ৬: বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন: ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন ও কার্যক্রম একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার ফল। উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূচনা থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিরা এখানে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্বে এই কার্যক্রম নানা রূপে বিস্তৃত হয় এবং রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাবেও ভিন্ন মাত্রা পায়।

৬.১ ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে কার্যক্রম

ব্রিটিশ আমলে খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মকাণ্ড সরকারিভাবে উৎসাহিত করা হতো। ইংরেজরা উপনিবেশকে দীর্ঘস্থায়ী করতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টান মিশনারিদের ব্যবহার করত।

১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরির আগমন ছিল এই ধারার সূচনালগ্ন। পরবর্তীতে ক্যালকাটা ও সেরামপুর ছিল মিশনারি কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু, যার প্রভাব পূর্ববঙ্গেও পড়ে।

মুসলমানদের শিক্ষাবিমুখতা ও দরিদ্রতা ব্যবহার করে মিশনারিরা শিক্ষা, চিকিৎসা ও ত্রাণকেন্দ্রের মাধ্যমে ধর্মান্তরণের কাজ চালিয়ে যায়।

পাকিস্তান আমলেও পূর্ব পাকিস্তানে মিশনারিদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। যদিও সংখ্যায় তারা ছিল কম, তথাপি পাহাড়ি অঞ্চল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারা কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মান্তরণ চলমান ছিল।

৬.২ ১৯৭১ পরবর্তী সুযোগ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্য যেমন স্বাধীনতার দ্বার খুলে দেয়, তেমনি খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্যও এক নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক এনজিও এবং খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা ‘মানবিক সহায়তার’ নামে প্রবেশ করে।

সেই সময় মানবিক বিপর্যয়, দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তা কাজে লাগিয়ে তারা খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয়, শিক্ষা ও আর্থিক সহায়তার বিনিময়ে ধর্মান্তরণের পথ প্রশস্ত করে।

১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যেই আটটি নতুন মিশনারি সংস্থা বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে, যেমন: World Vision, Caritas, CCDB ইত্যাদি।

এই সময়কালে সরকারের পক্ষ থেকেও বিদেশি সহায়তার প্রয়োজন থাকায় মিশনারি সংস্থাগুলোর উপর বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি, বরং বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হয়।

৬.৩ রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। এই পরিবর্তন একদিকে ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর সন্তুষ্টি নিশ্চিত করলেও, মিশনারিদের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে না—কারণ তারা তখন 'উন্নয়ন সহযোগী' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সরকার মিশনারি এনজিওদের তৎপরতা সম্পর্কে শুরুতে সর্তক না হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিশনারিদের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে—বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তরণ নিয়ে।

বর্তমানে সরকারি নীতিতে এনজিও নিয়ন্ত্রণের নানা উদ্যোগ থাকলেও, খ্রিস্টান এনজিওরা তাদের আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং মানবিক সহায়তার মাধ্যমে প্রভাব বজায় রাখছে।

এই অধ্যায় থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টান মিশনারিরা কৌশলগতভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাষ্ট্রীয় শিথিলতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে।

অধ্যায় ৭: মিশনারিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কৌশল

খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের সমাজ ও অর্থনীতির দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম বিস্তারে একাধিক কৌশল গ্রহণ করেছে। এই কৌশলগুলো সরাসরি ধর্মান্তরণ কিংবা ধর্মীয় অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়েছে, যা জাতীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় ঐক্য ও নিরাপত্তার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—

৭.১ দারিদ্র্য ব্যবহার

বাংলাদেশের একটি বড় অংশ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই দারিদ্র্যকে 'ধর্মান্তরণের সুযোগ' হিসেবে দেখেছে।

দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলোকে খাদ্য, কাপড়, চিকিৎসা, আশ্রয় ও শিক্ষা সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথমে সহানুভূতি অর্জন করা হয়, পরে ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের দিকে প্রলুব্ধ করা হয়।

চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও অন্যান্য পার্বত্য ও প্রান্তিক এলাকায় এমন কর্মকৌশল দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

৭.২ উন্নয়নের নামে প্রভাব বিস্তার

বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা ও এনজিও উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নামে কাজ করলেও তাদের প্রকৃত লক্ষ্য অনেক সময়ই ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার।

"World Vision", "Caritas Bangladesh", "Christian Life Bangladesh" ইত্যাদি সংস্থা চিকিৎসা সেবা, শিশু পুষ্টি, শিক্ষা প্রকল্প, নারী ক্ষমতায়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আড়ালে ধর্মীয় অনুপ্রবেশ চালিয়ে যাচ্ছে।

এসব উন্নয়ন কার্যক্রমে অধিকাংশ সময় খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রতীক, এবং আদর্শের প্রচার করা হয়। দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ উন্নয়নের সুযোগ পেতে বাধ্য হয়ে মিশনারিদের সাথে ধর্মীয় ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ হন।

৭.৩ ধর্মান্তরের অর্থনৈতিক চাহিদা

মিশনারিরা ধর্মান্তরণকে একটি "চুক্তিভিত্তিক প্রক্রিয়া"তে পরিণত করেছে যেখানে ধর্ম পরিবর্তনের বিনিময়ে সরাসরি অর্থ, চাকরি, আবাসন ও বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেওয়া হয়।

একটি আলোচিত ঘটনায় দেখা যায়, "World Vision of Bangladesh" প্রায় ৫০০ মুসলিম কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে, কারণ তারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি।

সমাজে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ভাতা, উপহারের ব্যবস্থা করা হয় এবং নতুন খ্রিস্টানদের জন্য চার্চ, হোস্টেল ও ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়—যা সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করে।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও অভাব-অনটনের শিকার পরিবারগুলো এই সুবিধাগুলোর কারণে ধর্মান্তরণে রাজি হয়ে যায়।

এই অধ্যায় থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টান মিশনারিরা দারিদ্র্য, উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তার মতো সংবেদনশীল বিষয়কে ধর্মান্তরের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এটি একটি পরিকল্পিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল, যা শুধু ধর্মীয় নয় বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার জন্যও হুমকিস্বরূপ।

অধ্যায় ৮: শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রভাব

শিক্ষা হলো সমাজগঠনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলাদেশে তাদের ধর্ম প্রচার কার্যক্রমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা শুধু জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেই নয় বরং ধর্মীয় চিন্তাভাবনার গঠন ও মানসিকতা প্রভাবিত করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৮.১ মিশনারি স্কুল ও কলেজ

ব্রিটিশ আমল থেকেই মিশনারিরা শিক্ষা খাতকে তাদের কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে। ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি, নটর ডেম কলেজ, হোলি ক্রস কলেজ, চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড, রাজশাহীর সেন্ট পলস স্কুল ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিশনারিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

এসব প্রতিষ্ঠান সাধারণত উন্নত মানের শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান ও উন্নত অবকাঠামোর কারণে জনপ্রিয় হলেও এর মাধ্যমে খ্রিস্টান সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

অনেক সময় খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন: ক্রিসমাস, ঈস্টার, বাইবেল পাঠ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসাহিত করা হয়, যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের জন্য সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব তৈরি করে।

৮.২ পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় প্রভাব

মিশনারি পরিচালিত স্কুলগুলোতে পাঠ্যসূচিতে সুক্ষ্মভাবে খ্রিস্টান ধর্মীয় চিন্তা, নৈতিকতা ও জীবনদর্শন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও এগুলো সরাসরি ধর্মীয় শিক্ষার নামে না থাকলেও মূল্যবোধের শিক্ষার আড়ালে তা প্রচার করা হয়।

খ্রিস্টান ধর্মের গল্প, ইতিহাস ও নেতৃবৃন্দের জীবনকাহিনি উপস্থাপন করে মুসলিম ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মানসিক গঠনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি সহ-শিক্ষা কার্যক্রমেও বাইবেল পাঠ, খ্রিস্টান সঙ্গীত এবং খ্রিস্টান মূল্যবোধ বিষয়ক অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

৮.৩ আদিবাসী শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যকরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে প্রধান টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এইসব এলাকার দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের জন্য আবাসিক স্কুল, হোস্টেল ও স্কলারশিপ চালু করা হয়।

আদিবাসী শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী হোস্টেল জীবন, নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং খ্রিস্টান শিক্ষকদের প্রভাবের মাধ্যমে সহজেই খ্রিস্টান চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়।

এমনকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এইসব হোস্টেল বা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার চাপ দেওয়া হয় কিংবা সময়ের সঙ্গে ধর্মান্তরণ ঘটে।

উপসংহার:

শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারিদের এই প্রভাব শুধু ধর্মান্তরের সরাসরি মাধ্যম নয়, বরং এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনন, মূল্যবোধ ও আত্মপরিচয়কে খ্রিস্টান ধাঁচে রূপান্তর করার একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা। তাই এই বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা, রাষ্ট্রীয় নজরদারি এবং বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

অধ্যায় ৯: স্বাস্থ্যসেবার আড়ালে প্রচার কার্যক্রম

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং এটি মানবিক সহায়তার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলাদেশে তাদের ধর্ম প্রচার কার্যক্রমে এই সেবাকে একটি কার্যকর ও কৌশলগত মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে।

৯.১ হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র

বাংলাদেশে অনেক খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মেমোরিয়াল ক্রিশ্চিয়ান হাসপাতাল (বান্দরবান), মিশনারি মেডিকেল সেন্টার (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), লালমোহন খ্রিস্টান ক্লিনিক (ভোলা) ইত্যাদি।

এই হাসপাতালগুলোতে সাধারণত গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চিকিৎসা প্রদান করা হয় এবং এখানেই শুরু হয় ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের কার্যক্রম। রোগীদের ও অভিভাবকদের মাঝে বাইবেল বিতরণ, প্রার্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়।

চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকেই ধর্মপ্রচারকও; তারা চিকিৎসার সময় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের নামে খ্রিস্টান মতবাদ উপস্থাপন করেন।

৯.২ গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় কৌশল

শহর ও মফস্বল ছাড়িয়ে মিশনারিরা গ্রামীণ এলাকায় মোবাইল মেডিকেল টিম, স্বাস্থ্য ক্যাম্প, টিকাদান কর্মসূচি ও মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।

গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া, প্রসূতি মায়েদের ও নবজাতকদের বিনামূল্যে ওষুধ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান—এসবের মাধ্যমে তারা সহজেই মানুষের আস্থা অর্জন করে এবং পরে ধর্মীয় আলাপ শুরু করে।

একাধিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এসব গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে ছোট বাইবেল, ধর্মীয় বই এবং প্রার্থনার বই দেওয়া হয়, যা তারা রোগীদের ও পরিবারকে উপহার হিসেবে দিয়ে থাকে।

৯.৩ চিকিৎসার বিনিময়ে ধর্মান্তর

মানবিক দুর্বলতা ও চরম অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা চিকিৎসাকে ধর্মান্তরের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষত জটিল রোগে আক্রান্ত দরিদ্র রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার শর্ত হিসেবে ধর্মান্তরের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

চিকিৎসার সময় প্রার্থনা সেশন, খ্রিস্টান গানের পরিবেশন এবং খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে তারা রোগীদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করে তোলে।

কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে, চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পূর্বে ধর্মান্তরের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে নিরক্ষর রোগীদের ক্ষেত্রে।

উপসংহার:
স্বাস্থ্যসেবা এক পবিত্র ও মানবিক উদ্যোগ, অথচ মিশনারিরা এটিকে ধর্মান্তরের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। দরিদ্র, অসহায় ও অসুস্থ মানুষদের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ধর্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কাঠামোকে ধ্বংস করার এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার এমন কৌশলগত ব্যবহার প্রতিহত করতে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, সচেতনতা এবং বিকল্প ইসলামী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ।

অধ্যায় ১০: এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগিতার মুখোশ

খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের বিস্তারে সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি হলো এনজিও (NGO) তথা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো। এই প্রতিষ্ঠানগুলো জনকল্যাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা—এসব মহৎ উদ্দেশ্যের মুখোশ পরিধান করে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বাস্তবে অনেক এনজিওর মূল উদ্দেশ্য উন্নয়ন নয়, বরং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ধর্মান্তর সাধন।

১০.১ প্রধান এনজিওসমূহের নাম ও কার্যক্রম

বাংলাদেশে যেসব এনজিও সরাসরি বা পরোক্ষভাবে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমে যুক্ত, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

World Vision Bangladesh – শিশু পুষ্টি, শিক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নামে প্রচুর তহবিল ব্যয় করে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টধর্মে আনয়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।

CARITAS Bangladesh – একটি ক্যাথলিক মিশনারি সংস্থা, যা সমাজকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রচারে সক্রিয়।

Christian Commission for Development in Bangladesh (CCDB) – শিক্ষাব্যবস্থা, যুব উন্নয়ন, ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের নামে খ্রিস্টান ধর্মীয় মতবাদ ছড়ায়।

Dipshikha, Rainbow House, Life Bangladesh, ActionAid, Swedish Free Mission ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে এবং তাদের কার্যক্রমে ধর্মীয় প্রভাব লক্ষণীয়।

এছাড়াও প্রায় ৩০,০০০ এনজিও বাংলাদেশে নিবন্ধিত, যার মধ্যে অনেকে সরাসরি মিশনারিদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

১০.২ বিদেশি অর্থায়নের উৎস

এই এনজিওগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ আসে বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের চার্চ, ধর্মীয় সংস্থা ও দাতা সংস্থার কাছ থেকে। যেমন:

USAID (United States Agency for International Development)

Norwegian Church Aid

Danish Missionary Boards

Christian Aid (UK)

The Lutheran World Federation

অনেক সময় এই অর্থায়ন হয় “মানবিক সহায়তা”, “দুর্যোগকালীন ত্রাণ”, বা “নারী অধিকার রক্ষা” ইত্যাদি শিরোনামে, যাতে জনগণের সন্দেহ না জাগে।

এই অর্থের বড় অংশ খরচ হয় চার্চ নির্মাণ, বাইবেল বিতরণ, ধর্মান্তরিতদের আবাসন, এবং স্থানীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণে।

১০.৩ "উন্নয়ন" শব্দের অপব্যবহার

"উন্নয়ন" শব্দটি মিশনারি সংস্থাগুলো এমনভাবে ব্যবহার করছে যেন তারা একমাত্র ন্যায্য ও নৈতিক কর্তৃত্ব নিয়ে এসেছে দরিদ্রদের সাহায্যে। অথচ বাস্তবে:

এসব উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নির্ভরশীলতা শেখানো হয়, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে।

"উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জনগণকে মানসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দুর্বল করে তোলা হয়, যা তাদেরকে ধর্মান্তরের দিকে ঠেলে দেয়।

বাস্তব উন্নয়ন কার্যক্রমের চেয়ে ধর্মীয় সভা, বাইবেল ক্লাস, ক্যাম্প প্রোগ্রাম, ও গীর্জা প্রতিষ্ঠায় বেশি অর্থ ব্যয় হয়।

অনেক গবেষক এবং বিশ্লেষক মনে করেন, "উন্নয়ন" এখন মিশনারি কার্যক্রমের এক প্রকার আচ্ছাদন মাত্র—একটি 'কোড-ওয়ার্ড', যা দিয়ে তারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করে।

উন্নয়ন একটি উচ্চতর আদর্শ, কিন্তু তা যদি হয় ধর্মান্তরের হাতিয়ার, তবে তা মানবতাবিরোধী ষড়যন্ত্রে রূপ নেয়। বাংলাদেশে বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত অনেক এনজিও সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। এসব সংস্থার কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ করা এখন সময়ের দাবি। প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য, জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, এবং ইসলামি বিকল্প সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগ।

অধ্যায় ১১: পাহাড়ি অঞ্চলে ধর্মান্তর কর্মকাণ্ড (CHT অঞ্চলের উপর বিশেষ আলোচনা)

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল—যার মধ্যে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা অন্তর্ভুক্ত—একটি বিশেষ ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এলাকা। এখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, ধর্মীয় বৈচিত্র্য, এবং রাষ্ট্রীয় অবহেলার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা দীর্ঘদিন ধরে গোপনে ও প্রকাশ্যে ধর্মান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মুখোশ পরে তারা এ অঞ্চলে ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

১১.১ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে কার্যক্রম

এই তিন জেলাতেই খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপকভাবে চলমান:

বান্দরবান: মিশনারিরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় এখানে। মারমা, ম্রো, ত্রিপুরা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সুবিধা, খাদ্য ও আশ্রয়ের বিনিময়ে ধর্মান্তর চালানো হচ্ছে। কিছু এলাকায় গীর্জার সংখ্যা মসজিদের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

রাঙ্গামাটি: খ্রিস্টান মিশনারিদের এনজিওগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা প্রকল্প ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মূলত পাহাড়ি আদিবাসীদের লক্ষ্য করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বহু পরিবার বাইবেল ক্লাস ও ধর্মীয় শিবিরে অংশ নিচ্ছে, যা পরবর্তীতে ধর্মান্তরের দিকে ঠেলে দেয়।

খাগড়াছড়ি: এখানে খ্রিস্টান বিদ্যালয়, বোর্ডিং ও চার্চ স্থাপন করে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই ধর্মান্তরের পথ তৈরি করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের নামে বাইবেল শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

—

১১.২ আদিবাসীদের মধ্যে প্রভাব

সাংস্কৃতিক ক্ষয়: খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে ঐতিহ্যগত বৌদ্ধ ও অ্যানিমিস্ট (প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক) বিশ্বাসে ধ্বস নেমেছে। নিজেদের ঐতিহ্য, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও আচারবিধিতে পরিবর্তন আসছে।

ধর্মীয় বিভাজন: একই পরিবার বা সম্প্রদায়ের সদস্যরা মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। এতে সামাজিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে এবং বিভাজন গভীর হচ্ছে।

নবধর্মান্তরিতদের বিশেষ সুবিধা: গীর্জা ও এনজিও সমর্থিত সংস্থাগুলো তাদের জন্য আবাসন, চাকরি ও বিদেশে স্কলারশিপের সুযোগ করে দেয়, যা অন্যদের জন্য অনুপলভ্য।

১১.৩ সরকার ও সামরিক শক্তির অবস্থান

সরকারি নিষ্ক্রিয়তা: রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মান্তর রোধে কার্যকর কোনো নীতিমালা নেই। বরং উন্নয়ন সহায়তার নামে অনেক খ্রিস্টান সংস্থা সরকারিভাবে অনুমোদিত এনজিও হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তি: এ চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের মধ্যে এক ধরনের পৃথক স্বীকৃতি তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে কিছু গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের উত্থান ঘটায়। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলে নিজস্ব "খ্রিস্টান বেল্ট" তৈরি করছে।

সামরিক শক্তির ভূমিকা: সেনাবাহিনী কখনো কখনো ধর্মান্তর প্রতিরোধে ভূমিকা রাখলেও, অনেকে অভিযোগ করেছেন যে কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টান এনজিওগুলোর কার্যক্রমকে উপেক্ষা বা পরোক্ষ সহযোগিতা করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্পর্শকাতর ও কৌশলগত এলাকা। এখানে ধর্মান্তর কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় নয়, বরং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হয়ে উঠতে পারে। খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব শুধু ধর্মীয় বিভাজনই নয়, বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটও সৃষ্টি করছে। এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিত নীতি গ্রহণ ও আদিবাসী জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় ইসলামি বিকল্প ব্যবস্থার প্রচলন এখন সময়ের দাবি।

অধ্যায় ১২: আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করে থাকে, তার একটি প্রধান অংশ হলো আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্বাচন করা। এদের মধ্যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রাষ্ট্রীয় সেবা থেকে বঞ্চিত থাকার বাস্তবতা এবং সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে একধরনের সামাজিক দুর্বলতা বিরাজ করে, যা মিশনারিদের জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে।

১২.১ জাতিগত ও ভাষাগত দুর্বলতা

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলসহ উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত আদিবাসীরা শতাধিক ভাষা ও উপভাষায় কথা বলে। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে সাঁওতাল, মারমা, চাকমা, ম্রো, রাখাইন, ত্রিপুরা, তেমনই রয়েছে মাহালী, ওঁরাঁও, ও কোচ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী।

ভাষাগত বিচ্ছিন্নতা: এরা অনেক সময় রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা ভালোভাবে না জানায় সরকারি সেবা গ্রহণে অসুবিধায় পড়ে। মিশনারিরা তাদের নিজস্ব ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে তাদের ধর্মান্তরে প্রলুব্ধ করে।

জাতিগত বিচ্ছিন্নতা: মূলধারার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তারা আত্মপরিচয় সংকটে ভোগে। মিশনারিরা "বিশ্ব খ্রিস্টান সমাজের সদস্য" হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের মধ্যে একধরনের গর্ববোধ তৈরি করে, যা তাদের ধর্মান্তরের পথে প্রভাবিত করে।

১২.২ খাদ্য ও বসতি বিনিময়ে ধর্মান্তর

অনেক মিশনারি সংগঠন ক্ষুধার্ত ও গৃহহীন জনগণের মাঝে খাদ্য বিতরণ, গৃহ নির্মাণ প্রকল্প ও আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে প্রথমে সহানুভূতির সম্পর্ক গড়ে তোলে। এরপর এই সুবিধাগুলো "খ্রিস্টান হওয়ার শর্তে" দেওয়া হয়:

ভর্তুকিযুক্ত চাল, ডাল, ও ত্রাণসামগ্রী: খাদ্যসঙ্কটে থাকা পরিবারগুলোকে এসব দিয়ে প্রাথমিকভাবে আকৃষ্ট করা হয়।

গৃহনির্মাণ সহায়তা: খ্রিস্টান হলে ঘর নির্মাণে উপকরণ, অর্থ ও শ্রমিক দেওয়া হয়। এতে অনেকে নিরুপায় হয়ে ধর্মান্তরিত হন।

আয়ের উৎস প্রদান: ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ঋণ ও নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকল্প চালু করে খ্রিস্টান এনজিওগুলো, যার মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ ধর্মান্তরের দিকে ধাবিত হয়।

১২.৩ আদিবাসী সংস্কৃতির বিলুপ্তি

খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের ফলে আদিবাসীদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার, ধর্মীয় বিশ্বাস ও উৎসবগুলোর অবমূল্যায়ন শুরু হয়।

ধর্মীয় উৎসব থেকে বিচ্যুতি: বৌদ্ধ বা অ্যানিমিস্ট উৎসব যেমন বয়েসাবি, জুম উৎসব ইত্যাদি পরিত্যক্ত হয় এবং খ্রিস্টান উৎসব পালনে উৎসাহ দেওয়া হয়।

পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন: ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও খাদ্যাভ্যাসকে ‘পৌত্তলিকতা’ হিসেবে দেখিয়ে খ্রিস্টান সংস্কৃতির অনুকরণে নতুন রীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়।

সাংস্কৃতিক বিমূর্ততা: নতুন প্রজন্ম তাদের নিজস্ব ইতিহাস, লোককাহিনি, গান ও নৃত্য সম্পর্কে ধীরে ধীরে অজ্ঞ হয়ে পড়ে। এর ফলে একটি প্রাচীন সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে খ্রিস্টান মিশনারিরা যে কৌশল অনুসরণ করছে, তা নিছক ধর্মীয় তৎপরতা নয়; বরং তা একটি সাংস্কৃতিক দখল ও জাতিগত পরিবর্তনের গভীর ষড়যন্ত্র। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, আদিবাসীদের প্রতি আন্তরিক সমাজসেবা এবং ইসলামি বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা।

অধ্যায় ১৩: ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর প্রভাব

বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজ শুধু আদিবাসী বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা কৌশলে মুসলিম সমাজের ভেতরেও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে। ধর্মান্তরের পাশাপাশি, ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে দুর্বল করা এবং সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া তাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে এ প্রভাবসমূহ পর্যালোচনা করা হলো।

১৩.১ ইসলামী আচার-আচরণে পরিবর্তন

খ্রিস্টান মিশনারিরা একদিকে যেমন দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ইসলামী জীবনের রীতিনীতি ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

ইসলামী পোশাক ও শালীনতা: মিশনারি নিয়ন্ত্রিত স্কুল, কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইসলামী পর্দা ও শালীন পোশাককে বাধাগ্রস্ত করে আধুনিকতার নামে পশ্চিমা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ইবাদতের প্রতি উদাসীনতা: আর্থিক সহায়তা বা শিক্ষা পেতে গিয়ে মুসলিমরা ধর্মীয় দায়িত্বে অবহেলা শুরু করে, নামাজ, রোজা, হালাল-হারামের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলামী উৎসবের অবমূল্যায়ন: ঈদ, রমজান, মিলাদ, মাওলানা ওলামাদের বয়ানকে ‘গোঁড়ামি’ বলে অবহেলা করা হচ্ছে, যার ফলে তরুণ প্রজন্ম ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

১৩.২ মুসলিম তরুণদের লক্ষ্যবস্তু করা

তরুণ সমাজ যে কোনো পরিবর্তনের প্রধান বাহক। খ্রিস্টান মিশনারিরা এটিকে ভালোভাবেই বুঝেছে এবং তাই তারা মুসলিম তরুণদের মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে।

বৃত্তি ও বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ: কিছু মিশনারি সংগঠন মুসলিম ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও স্কলারশিপের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের আস্তে আস্তে খ্রিস্টধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে।

আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাব: ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, মিশনারি পরিচালিত কলেজে ইসলামবিদ্যা সংকুচিত করে খ্রিস্টীয় মতাদর্শ ঢোকানো হচ্ছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার: খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মিউজিক ভিডিও, এনিমেশন এবং অনলাইন গেমের মাধ্যমে তরুণদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৩.৩ সামাজিক বিচ্ছিন্নতা

ধর্মান্তর বা সংস্কৃতি পরিবর্তনের প্রভাবে একটি মুসলিম ব্যক্তি বা পরিবার ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ প্রক্রিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

পরিবারে ফাটল: একজন সদস্য ধর্মান্তরিত হলে পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। মা-বাবা, ভাই-বোনের মধ্যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়।

মুসলিম সমাজ থেকে বিতাড়ন: যারা খ্রিস্টান মূল্যবোধে প্রভাবিত হয়ে ধর্মের প্রতি নির্লিপ্ত হয়, তারা ইসলামি সংস্কৃতিমূলক আয়োজন, মসজিদে যাওয়া বা ইসলামী সংগঠনে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

নবধর্মান্তরিতদের বিশেষায়িত আবাসন: মিশনারিরা আলাদা ঘেটো বা ‘কমিউনিটি’ তৈরি করছে যেখানে একবার যারা খ্রিস্টান হয়, তাদের ইসলামী সমাজে ফেরত আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপর খ্রিস্টান মিশনারিদের এই প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক চ্যালেঞ্জ। তারা কেবল ধর্ম পরিবর্তন করছে না, বরং মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য ও জীবনব্যবস্থাকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই আগ্রাসনের মোকাবেলায় দরকার সচেতনতা, শিক্ষা, ইসলামী সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ এবং সরকারি নীতিতে কঠোরতা।

অধ্যায় ১৪: মুসলিম সমাজে ধর্মান্তরের চেষ্টার ধারা

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মান্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করা। যদিও ইসলামের প্রতি এ দেশের মানুষের অগাধ ভালোবাসা রয়েছে, তথাপি সমাজের আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দুর্বলতাকে পুঁজি করে মিশনারিরা মুসলিম সমাজেও ধর্মান্তরের কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। এই অধ্যায়ে সে চেষ্টার মূল ধারা বিশ্লেষণ করা হলো।

১৪.১ আর্থিক লোভ দেখানো

মিশনারিরা মুসলিম জনগণের দরিদ্রতা ও অভাব-অনটনকে কেন্দ্র করে ধর্মান্তরের সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হিসেবে অর্থনৈতিক প্রলোভন ব্যবহার করে।

অর্থ সাহায্য: মুসলিম পরিবারকে মাসিক ভাতা প্রদান, খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ করে তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা হয়।

ঘর নির্মাণ ও জমি প্রদান: বসতবাড়ি বা জমি প্রদান করে দরিদ্র মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়, বিশেষত যাদের নিজস্ব কোনো সহায়-সম্পদ নেই।

ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি: এনজিওর মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ ও অনুদান দিয়ে, পরে সেটিকে ধর্মান্তরের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এভাবে মানুষকে আর্থিকভাবে নির্ভরশীল করে ধর্মান্তরে বাধ্য করা হয়। যদিও এই পদ্ধতি সরাসরি জোরপূর্বক নয়, এটি একটি প্রকার্যিত 'প্রভাব খাটানো' যার মাধ্যমে মানুষ পেটের দায়ে ধর্মত্যাগ করে।

১৪.২ বেকার যুবকদের চাকরির প্রলোভন

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকার যুবকদের সংখ্যা অনেক। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা চাকরির আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে ধর্মান্তরে প্রলুব্ধ করছে।

মিশনারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি: কিছু প্রতিষ্ঠান চাকরির জন্য নীরব শর্ত দেয় যে, চাকরি পেতে হলে খ্রিস্টধর্মে আগ্রহ দেখাতে হবে।

বিদেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি: অনেক সময় খ্রিস্টান এনজিও তরুণদের বিদেশে পাঠানোর সুযোগের প্রলোভন দেখায়, যার পিছনে ধর্মান্তরের উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ ও স্কলারশিপ: যুবকদের বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নিতে দেওয়া হয়, যেখানে ধাপে ধাপে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করে খ্রিস্টধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলা হয়।

এ ধরনের কর্মসংস্থানের প্রলোভনে পড়ে অনেকে নিজের ধর্মীয় পরিচয় বিসর্জন দেন, যদিও হয়তো অনুশোচনাও থাকে, কিন্তু তখন আর ফিরে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

১৪.৩ ধর্মীয় অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ

মুসলিম সমাজের একটি অংশে ধর্মীয় জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই ধর্মীয় অজ্ঞতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

কুরআন-হাদীস সম্পর্কে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা: ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা হয়। কখনো কখনো খ্রিস্টান ধর্মকে ইসলামের পরিপূরক হিসেবে তুলে ধরা হয়।

উপহার ও আবেগের ব্যবহার: ধর্মীয় উৎসবে উপহার প্রদান, সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রথমে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে পরে তা ধর্মান্তরে পরিণত করা হয়।

শিক্ষাহীন মুসলমানদের টার্গেট: যারা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, তাদের বুঝতে না পারার দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে খ্রিস্টীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনা হয়।

এই কৌশলগুলো ব্যবহৃত হয় বিশেষত গ্রামাঞ্চল বা চরম দারিদ্রপীড়িত এলাকায়, যেখানে মানুষের ধর্মচর্চা অনেক সময়ই লোকজ বিশ্বাসের সাথে মিশে যায়, এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার অভাব থাকে।

১৪.৪ নারীদের টার্গেটকরণ ও পরিবার-ভিত্তিক কৌশল

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তর কার্যক্রমে একটি সুপরিকল্পিত ও কৌশলগত লক্ষ্যবস্তু হলো নারী সমাজ। নারীরা যেহেতু পরিবার ও সমাজের ভিত্তিমূল, তাই তাদের প্রভাবিত করলে একটি গোটা পরিবারকেই ধর্মান্তরের পথে নেওয়া সহজ হয়। ফলে মিশনারি গোষ্ঠী নারীদের 'Soft Target' বা সহজলভ্য লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখে থাকে এবং তাদের জন্য আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ধর্মান্তরের এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত হয় আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে।

---

১. দরিদ্র ও প্রান্তিক নারীদের লক্ষ্যবস্তু করা

মিশনারি সংগঠনগুলো নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, ফ্রি চিকিৎসা, খাদ্য বিতরণ, সন্তানদের জন্য উপহার ও আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে আকৃষ্ট করে।

একাধিক NGO নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও 'নারীর ক্ষমতায়ন' নামে প্রকল্প চালিয়ে থাকে, যেগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ও খ্রিস্টান মূল্যবোধ গোপনে সংযুক্ত করা হয়।

অনেক নারীকে বিদেশে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তর করানো হয়।

---

২. ধর্মীয় অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ

নারীরা প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষায় অনেক সময় পিছিয়ে থাকায় সহজেই প্রভাবিত হয়। এ কারণে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে তাদের বিশ্বাস দুর্বল করার চেষ্টা করা হয়।

ইসলামের নারীবাদী ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকায় খ্রিস্টান মিশনারিরা নারী অধিকারের নামে বিকৃত তথ্য দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায়।

---

৩. মহিলা ফোকাসড এনজিও ও চার্চ কার্যক্রম

যেমন: World Vision, Caritas, LAMB, এবং Compassion International—এইসব সংস্থা গ্রামের দরিদ্র নারীদের নিয়ে গঠন করে 'মা ও শিশু সেবা দল' বা 'নারী উন্নয়ন গ্রুপ'।

এসব দলের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা ও অর্থসাহায্য দেওয়া হয়, পরে ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

---

৪. নারীদের ব্যবহার করে পরিবার ধর্মান্তরের কৌশল

একবার যদি একজন নারী খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, তবে মিশনারিরা তাকে ব্যবহার করে তার স্বামী, সন্তান, ভাই-বোনদের ওপর প্রভাব ফেলতে চায়।

নারীকে পরিবারে "ধর্মীয় দূত" হিসেবে ব্যবহার করে মিশনারিরা একটি গোটা পরিবারের ধর্মান্তর নিশ্চিত করতে চায়।

---

৫. নারীদের মাঝে খ্রিস্টান সাংস্কৃতিক চর্চা প্রবেশ করানো

খ্রিস্টান NGO গুলো উৎসবের সময় উপহার ও নতুন পোশাক দেয়, যাতে নারী ও শিশুদের মধ্যে খ্রিস্টান সংস্কৃতি জনপ্রিয় হয় (যেমন: ক্রিসমাস উৎসব, ইস্টার পার্টি)।

মেয়েদের জন্য ইংরেজি ভাষা শেখানো, বিদেশি সাহিত্য ও সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করে তাদের মানসিকভাবে 'ওয়েস্টার্নাইজ' করা হয়।

---

৬. পারিবারিক বন্ধন দুর্বল করার অপচেষ্টা

নারীকে স্বামীর অনুগত না হয়ে 'নিজস্ব চিন্তা' ও 'স্বাধীনতা'র নামে ইসলামবিরোধী মানসিকতা দেওয়া হয়।

পরিবারকে ইসলামি আচার-আচরণ থেকে সরিয়ে এনে খ্রিস্টান পারিবারিক সংস্কৃতি যেমন 'পিতার পরিবর্তে পাস্টরের পরামর্শ', 'যিশুর নামেই প্রতিদিন প্রার্থনা' ইত্যাদি চালু করা হয়।

খ্রিস্টান মিশনারিদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নারীদের নির্বাচন একটি কৌশলী পদক্ষেপ। তারা জানে, একজন মা, স্ত্রী বা বোনকে প্রভাবিত করতে পারলে একটি গোটা পরিবার ধর্মান্তরের পথে অগ্রসর হতে পারে। তাই মুসলিম সমাজকে নারীদের ইসলামি শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। ইসলাম নারীদের যে সম্মান দিয়েছে, তা জানানো ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের ধর্মান্তরের প্রলোভন থেকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি নারী কেন্দ্রিক NGO কার্যক্রমের ওপর কড়া নজরদারি রাখা আবশ্যক।

মুসলিম সমাজে ধর্মান্তরের এই চেষ্টাগুলো বহুমুখী ও সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আর্থিক অনটন, কর্মসংস্থানের অভাব এবং ধর্মীয় অজ্ঞতা—এই তিনটি দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের বিশ্বাস পরিবর্তনের অপচেষ্টা একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় দরকার ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার, আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, এবং ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক সামাজিক সংগঠনসমূহের সক্রিয় ভূমিকা।

১৫. মিশনারি কার্যক্রম ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় প্রসারেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা প্রভাব, যা ধীরে ধীরে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস এবং এই ধর্মান্তর প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ব্যবহারের প্রয়োগ দেশের ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতির পরিবেশকে নষ্ট করছে। নিচে এ প্রসঙ্গে তিনটি উপবিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১৫.১ সামাজিক সহিংসতা ও বিভাজন

খ্রিস্টান মিশনারি কার্যক্রমের ফলে সমাজে দ্বন্দ্ব, ভুল বোঝাবুঝি ও সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনাও ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে, বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে ধর্মান্তরের পর তাদের সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব, ও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান থেকে বিচ্যুতির ফলে বিভেদ বাড়ছে। এসব বিভাজন একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়ায়, অন্যদিকে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

১৫.২ কৌশলগত ধর্মান্তর

মিশনারিরা তাদের কার্যক্রমে সরাসরি ধর্মীয় প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও বাসস্থানের প্রলোভন দিয়ে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এই কৌশলগত ধর্মান্তরকে তারা "সেবা" বা "উন্নয়ন সহযোগিতা" নামে আড়াল করে। গ্রামীণ দরিদ্র, নিরক্ষর জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক আদিবাসীদেরকে লক্ষ্য করে ধর্মান্তরের মাধ্যমে একটি পরিকল্পিত খ্রিস্টান জনসংখ্যা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। ফলে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভেতরেও এক নতুন বিভক্তি তৈরি হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রূপ নিতে পারে।

১৫.৩ সংখ্যালঘু রাজনীতি

ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে সংখ্যালঘু অধিকার ও নিরাপত্তার কথা বলে ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিছু মিশনারি সংস্থা এবং এনজিও এই ধর্মান্তরিতদের সাংগঠনিকভাবে সংগঠিত করে সংখ্যালঘু রাজনীতির অংশ করে তুলছে। আন্তর্জাতিক সহায়তা ও পশ্চিমা দেশগুলোর রাজনৈতিক চাপ ব্যবহার করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টাও চালানো হচ্ছে। এর ফলে, একদিকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও দৃষ্টি-কটুতা তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে বিদেশি হস্তক্ষেপের ঝুঁকিও বাড়ছে।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা একটি দেশের স্থিতিশীলতা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতিগত ঐক্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। খ্রিস্টান মিশনারিদের পরিকল্পিত ও কৌশলগত ধর্মান্তর কার্যক্রম ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে যে সহনশীলতা ও সহাবস্থানের পরিবেশ থাকা উচিত, সেটিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এ থেকে উত্তরণে রাষ্ট্রের কঠোর নজরদারি, সচেতন নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ, এবং ইসলামী শিক্ষা ও সামাজিক জাগরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অধ্যায় ১৬: আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার ভূমিকা ও প্রভাব

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি ও ধর্মান্তর প্রচারণার পেছনে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্থাগুলো উন্নয়ন, মানবাধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি আকর্ষণীয় শিরোনামের আড়ালে খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে থাকে। অনেক সময় এদের অনুদান ও প্রকল্পগুলোর ভেতরেই সুপ্তভাবে ধর্মান্তর ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্য থাকে। এই অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর প্রকৃত কার্যকলাপ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে।

—

১৬.১ ইইউ, ইউএসএআইডি ও বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), ইউএসএআইডি (USAID) ও বিশ্ব ব্যাংক—এই তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বহু বছর ধরেই বাংলাদেশের তথাকথিত "উন্নয়ন খাতে" অর্থ প্রদান করে আসছে। তবে বাস্তবতা হলো, এই সংস্থাগুলোর অর্থায়ন কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য নয়, বরং সামাজিক রূপান্তরের উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়।

ইইউ ও খ্রিস্টীয় সাংস্কৃতিক মানদণ্ড: ইইউ প্রভাবশালী এনজিও ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মাধ্যমে এমন কিছু শর্ত আরোপ করে যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। অনেক ক্ষেত্রে মিশনারি সংগঠনগুলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে সরাসরি তহবিল প্রদান করা হয়।

ইউএসএআইডি-এর রাজনৈতিক প্রভাব: ইউএসএআইডি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রকল্পের আড়ালে ধর্মান্তর ও "নৈতিক সংস্কার"-এর কার্যক্রম পরিচালনায় মদদ দেয়। তারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আধুনিকায়নের নামে পশ্চিমা মূল্যবোধে রূপান্তর করতে চায়।

বিশ্ব ব্যাংকের নীতিনির্ধারণে প্রভাব: বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন করে এবং প্রায়শই পাঠ্যক্রম ও নীতিমালায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও "সামাজিক অন্তর্ভুক্তি"-র নামে খ্রিস্টীয় মানবিকতা প্রবেশ করায়।

এই সংস্থাগুলোর প্রভাবশালী অনুদান বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণেও প্রভাব বিস্তার করে, ফলে অনেক সময় সরকার জনগণের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

১৬.২ 'সুশীল সমাজ' এর ব্যবহৃত মুখোশ

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো প্রায়শই তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দেশীয় "সুশীল সমাজ" ও এনজিও গুলোর ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সুশীল সমাজের অনেকাংশই ধর্মীয় পক্ষপাত ও বিদেশি আদর্শে অনুপ্রাণিত।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবিরোধীতা: অনেক সংগঠন ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে ইসলামী মূল্যবোধকে তুচ্ছ করে, ধর্মীয় অনুশীলনকে পশ্চাদপদতা হিসেবে উপস্থাপন করে।

মানবাধিকারের নামে ধর্মান্তর সহায়ক নীতি: নারী ও শিশুর অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার—এমন ইস্যুতে কাজ করতে গিয়ে সুশীল সমাজের অনেক অংশ খ্রিস্টান এনজিও ও মিশনারিদের মিত্র হিসেবে কাজ করে।

মিডিয়া ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব: আন্তর্জাতিক তহবিলে পরিচালিত গবেষণা বা প্রচারণামূলক প্রবন্ধ-পুস্তক বা প্রতিবেদনগুলোতে ইসলাম বা মুসলিম সমাজের রীতিনীতিকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়।

এই মুখোশধারী সুশীল সমাজ কার্যত একটি ধর্মবিরোধী এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিপুষ্ট শ্রেণি তৈরি করছে, যারা সাধারণ মুসলমানদের মনোজগতে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে সহায়ক।

১৬.৩ বৈদেশিক চাপে সরকার

আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রায়শই বৈদেশিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাপে নতিস্বীকার করে।

নীতিমালায় সমঝোতা: নারী শিক্ষা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ইত্যাদি ইস্যুতে অনেক সময় এমন নীতিমালা গৃহীত হয়, যেগুলো দেশের ধর্মীয় সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী।

ধর্মীয় সংগঠনের কার্যক্রমে বাধা: সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চাপে ইসলামপন্থী সংগঠন বা দাওয়াতী কার্যক্রমের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচার-প্রচারণা নিয়ন্ত্রণে অনীহা দেখায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রভাব: পাঠ্যপুস্তকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামী চিন্তা বাদ দেওয়া, আর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন বাধ্যতামূলক করাও এই চাপে সরকারের করণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধরনের বিদেশি চাপ ও মদদের ফলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বকীয়তা হুমকির মুখে পড়ছে।

আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচন বা উন্নয়ন নয়, বরং তারা এক ধরনের সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই কাজ করছে। এই সংস্থাগুলোর অর্থায়ন, প্রভাব ও রাজনৈতিক চাপ বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই প্রয়োজন সচেতনতা, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ও নীতিনির্ধারকদের দায়িত্বশীলতা।

অধ্যায় ১৭: বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান ও পদক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি ধর্মপ্রাণ মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বহুপক্ষীয় চাপে সরকার অনেক সময় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াবলিতে দ্ব্যর্থতা প্রকাশ করে থাকে। একদিকে সরকার সংবিধানে ধর্মীয় অধিকার ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অন্যদিকে বৈদেশিক অনুদান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর চাপে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রমকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। এই অধ্যায়ে সংবিধান, এনজিও নীতিমালা এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারির প্রসঙ্গ নিয়ে সরকারের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করা হলো।

১৭.১ সংবিধানে ধর্মীয় অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষণা: সংবিধানের ৪১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—"প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার থাকবে।" এই অনুচ্ছেদ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেও, এর সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা ধর্মান্তরের প্রচারণায় নিরবচ্ছিন্নভাবে লিপ্ত হতে পারছে।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম: ১৯৮৮ সালে সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা এখনো বলবৎ আছে। তবে বাস্তবিক কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী মূল্যবোধকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার চেয়ে অনেক সময় ধর্মনিরপেক্ষতার নামে পশ্চিমা আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ধর্মীয় সাম্য নাকি ধর্মীয় সমতা?: সরকার 'ধর্মীয় সাম্য' প্রদানের নামে অনেক সময় ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে নীরব থাকে, যা এক ধরনের পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত দেয়। এই দ্বৈতনীতি মুসলিম জনগণের মাঝে সন্দেহ ও ক্ষোভের জন্ম দেয়।

১৭.২ এনজিও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রম তদারকির জন্য বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো: ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'এনজিও বিষয়ক ব্যুরো' (NGO Affairs Bureau) বিদেশি অনুদানপ্রাপ্ত এনজিওদের কার্যক্রম নিবন্ধন, অনুমোদন ও তদারকির দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু বাস্তবে এটি অনেক সময় প্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়।

নীতিমালার দুর্বল প্রয়োগ: অনেক মিশনারি সংস্থা নিজেদের কার্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবার আড়ালে পরিচালনা করে, যা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নজরদারির বাইরে থেকে যায়। কিছু সংস্থা প্রকল্পের নামে ধর্মান্তর, মিশনারি প্রশিক্ষণ ও গোপন ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত থাকে।

বিদেশি চাপ ও সুবিধাভোগী আমলাতন্ত্র: বিদেশি সাহায্যের নির্ভরতায় সরকার অনেক সময় এনজিওদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে পারে না। পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও অনৈতিক সহযোগিতা মিশনারিদের কাজকে সহজ করে দেয়।

১৭.৩ রাষ্ট্রীয় নজরদারি

সরকারের তরফ থেকে মাঝে মাঝে কিছু নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও, তা দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর নয়।

বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট: বিভিন্ন সময়ে দেশের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো কিছু খ্রিস্টান মিশনারি এনজিওর বিরুদ্ধে ধর্মান্তরের প্রমাণসহ রিপোর্ট পেশ করেছে। যেমন, ১৯৯৯ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছু এনজিওর বিরুদ্ধে সান্তাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তর প্রমাণ করেছে।

সীমিত কার্যক্রম: যদিও সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী মাঝে মাঝে অভিযানে যায় বা তদন্ত করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশি মদদে পরিচালিত এনজিওদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

সীমান্তবর্তী এলাকায় দুর্বল উপস্থিতি: বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো এলাকাগুলোতে রাষ্ট্রীয় তদারকি অত্যন্ত দুর্বল, যার সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলী কার্যক্রম চালিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের নীতিগত অবস্থান ধর্মীয় স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রক্ষার পক্ষে হলেও, বাস্তবে সরকারের পদক্ষেপ অনেক সময় দ্ব্যর্থতাপূর্ণ ও নমনীয়। সংবিধান ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় মিশনারিরা সুযোগ গ্রহণ করছে। তাই প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং ধর্মীয় সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

অধ্যায় ১৮: ইসলামি সংগঠনসমূহ ও নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচার কার্যক্রম ও ধর্মান্তরের প্রবণতা শুধু রাষ্ট্রকেই নয়, বরং ইসলামি সংগঠন, আলেম সমাজ, নাগরিক উদ্যোগ ও সচেতন মুসলিমদেরও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছে। মিশনারিদের কৌশলী কার্যক্রমের বিপরীতে ইসলামি সংগঠনসমূহ বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং সমাজের ভেতরে সচেতনতামূলক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই অধ্যায়ে আমরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে পর্যালোচনা করব।

১৮.১ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতনতামূলক কার্যক্রম

মসজিদভিত্তিক প্রচারণা: স্থানীয় মসজিদগুলোতে ইমামরা খুৎবার মাধ্যমে ধর্মান্তরের ক্ষতিকর দিক ও মিশনারিদের কৌশল সম্পর্কে মুসল্লিদের সতর্ক করেন। শুক্রবারের খুৎবায় অনেক সময় এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, যাতে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

দাওয়াহ প্রোগ্রাম: বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন যেমন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, তাবলিগ জামাত, হেফাজতে ইসলাম, ইত্যাদি গ্রাম ও শহরে দাওয়াহ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ঈমানি জ্ঞান ছড়িয়ে দিচ্ছে, যাতে মিশনারিদের প্রভাব হ্রাস পায়।

ইসলামি শিক্ষা ও মক্তব: ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মাঝে ইসলামি মূল্যবোধ গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে তারা পশ্চিমা অপসংস্কৃতি ও ধর্মান্তরের ফাঁদ থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারে।

ফতোয়া ও ধর্মীয় বার্তা: অনেক সময় জাতীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে ইসলামী স্কলাররা সংবাদ সম্মেলন ও সম্মেলনের মাধ্যমে মিশনারি কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন, এবং মুসলিমদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

১৮.২ মিডিয়া ও সাংবাদিকতার ভূমিকা

ইসলামী মিডিয়ার প্রতিবাদমূলক ভূমিকা: মাসিক মদীনা, দিশারী, আত-তাওহীদ, আল বাইয়্যিনাহ, ও ইসলামী জীবনধারাভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেল ও অনলাইন পোর্টালগুলো খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।

সংবাদপত্র ও টকশো: কিছু প্রিন্ট মিডিয়া, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার বাইরে থাকা সংবাদমাধ্যমগুলো বিভিন্ন সময় ধর্মান্তর কার্যক্রম, এনজিও অপকর্ম ও বিদেশি প্রভাব নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তবে এই প্রতিবেদনগুলোর মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

গণসচেতনতা সৃষ্টি: নাগরিক সমাজে মিশনারিদের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে ইউটিউব, ফেসবুক, ব্লগ, ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে অনেক ইসলামিক স্কলার ও সাধারণ মানুষ আলোচনা করছে, ভিডিও তৈরি করছে ও বই-পুস্তক প্রকাশ করছে।

১৮.৩ নাগরিক আন্দোলন ও চ্যালেঞ্জ

প্রতিবাদ মিছিল ও মানববন্ধন: বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন ও নাগরিক উদ্যোগ যেমন ইসলামী ছাত্রসংস্থা, খেলাফত মজলিস, তাওহীদি জনতা, সময় সময় মিশনারিদের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল, মানববন্ধন করে থাকে।

আইনি প্রতিক্রিয়া: ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বা ধর্মান্তরের প্ররোচনা জনিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে মামলা করা হয়। তবে এধরনের মামলা খুব সীমিত এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তা ছাড়া টেকসই হয় না।

চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা: একদিকে ইসলামি সংগঠনগুলো জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করলেও, রাষ্ট্রীয় নজরদারির অভাব, মিডিয়ার নিরবতা, এবং বিদেশি অনুদানের শক্তি এগুলোর সামনে এদের কার্যক্রম অনেক সময় চাপা পড়ে যায়।

আলোচনার ঘাটতি: সমাজের মূলধারার বুদ্ধিজীবীরা অনেক সময় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন না, যার ফলে নাগরিক প্রতিক্রিয়া দুর্বল হয়।

-

খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ইসলামি সংগঠনসমূহ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজ বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আসছে। তবে এই কার্যক্রমকে আরও সংগঠিত, তথ্যভিত্তিক ও কৌশলী করে তোলা প্রয়োজন। সরকার ও সমাজের অন্যান্য অংশের সমর্থন ছাড়া এই সচেতনতা দীর্ঘমেয়াদে সাফল্য পাবে না।

অধ্যায় ১৯: আমাদের করণীয় (নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দিক)

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও ধর্মান্তর কার্যক্রম শুধু একটি ধর্মীয় সংকট নয়, বরং এটি একটি বৃহৎ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ। এই সংকট মোকাবেলায় মুসলিম সমাজকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে, সচেতন হতে হবে, এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নীতিমালা সংস্কার করতে হবে। জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব কী—তা এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হলো।

১৯.১ সচেতনতা বৃদ্ধি

পরিবার ও সমাজভিত্তিক সচেতনতা: পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আদর্শকে জাগ্রত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতা চর্চার পরিধি বাড়াতে হবে।

মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার: ডিজিটাল যুগে সামাজিক মাধ্যম একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ফেসবুক, ইউটিউব, ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মান্তরের ভয়াবহতা তুলে ধরে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

পুস্তক ও গবেষণাধর্মী লেখা: ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখকদের দায়িত্ব ধর্মান্তর বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করা ও সেগুলো সহজবোধ্য করে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া।

গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে দাওয়াহ কার্যক্রম: যেসব অঞ্চলে মানুষ বেশি অসচেতন বা দরিদ্র, সেসব স্থানে বিশেষভাবে দাওয়াহ প্রোগ্রাম চালাতে হবে। স্থানীয় ভাষায় ইসলামি বক্তব্য, পোস্টার, ভিডিও এবং পাঠ্যসামগ্রী তৈরি করতে হবে।

১৯.২ যুব সমাজকে শিক্ষিত ও ধর্মীয়ভাবে সচেতন করা

ইসলামি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়: মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি মূল্যবোধ সংযুক্ত আধুনিক পাঠ্যক্রম চালু করা প্রয়োজন। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

তারুণ্যের আত্মবিশ্বাস জাগানো: যুব সমাজকে জানাতে হবে যে তারা কোনো দুঃখজনক ভাগ্য নিয়ে জন্ম নেয়নি বরং ইসলামি সংস্কৃতি ও পরিচয়ের উত্তরাধিকারী। আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে ধর্মান্তরের প্রলোভন প্রতিরোধ সম্ভব।

চাকরি ও অর্থনৈতিক বিকল্প সৃষ্টির চেষ্টা: যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বিদেশি এনজিও বা মিশনারিদের অর্থনৈতিক ফাঁদে পড়া থেকে রক্ষা করা যায়। উদ্যোক্তা তৈরি, কারিগরি শিক্ষা, ও মাইক্রো-ইকোনোমি প্ল্যান গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: তরুণদের মাঝে ইসলামি সংগীত, সাহিত্য, নাটক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করে তাদের সাংস্কৃতিকভাবে ইসলামি ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট করা দরকার।

১৯.৩ রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সংস্কার

এনজিও নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন প্রয়োগ: সরকারের উচিত এনজিও নীতিমালা আরও শক্তিশালী করা, যাতে কোনো এনজিও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করতে না পারে। তদারকি বাড়ানো এবং নিয়মিত অডিট করা আবশ্যক।

সংবিধানে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ধারা জোরদার: বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। আইনি ও প্রশাসনিক পর্যায়ে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার নীতিগুলো কার্যকর করা জরুরি।

আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায় কূটনৈতিক দক্ষতা: বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা বা রাষ্ট্র যখন ধর্মান্তর কার্যক্রমে অর্থায়ন করে, তখন কূটনৈতিকভাবে তাদের চাপ মোকাবেলা করে দেশের ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব।

প্রতিরোধমূলক প্রচারণা চালানো: সরকারের পক্ষ থেকেও জনগণকে সতর্ক করার জন্য টিভি, রেডিও, ও সামাজিক মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো উচিত—যেমন "ধর্মান্তরের নামে প্রতারণা" ইত্যাদি ক্যাম্পেইন।

বাংলাদেশের খ্রিস্টান মিশনারি সমস্যা কোনো সাধারণ ইস্যু নয়। এটি একটি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ইস্যু। তাই এর প্রতিকারে একটি সম্মিলিত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য। ব্যক্তি, সমাজ, এবং রাষ্ট্র—এই তিনটি স্তরে যথাযথ সচেতনতা, শিক্ষা ও আইনি প্রতিরোধ ছাড়া এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব নয়। আমাদের দায়িত্ব শুধু প্রতিক্রিয়া নয়, বরং সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

২০. প্রতিরোধমূলক কৌশল ও মুসলিমদের করণীয়

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারি তৎপরতা দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে, বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। মিশনারিরা উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দানকার্যকে ধর্মান্তরের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এ অবস্থায় মুসলিম সমাজের পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা অনুচিত ও আত্মঘাতী। প্রয়োজন সজাগ দৃষ্টি, সুসংগঠিত প্রতিরোধ এবং যথাযথ নীতি-কৌশল।

২০.১ ধর্মীয় সচেতনতা ও শিক্ষা বিস্তার

ইসলামি শিক্ষা: সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম ও নারী সমাজের মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।

মক্তব ও দারস সিস্টেম: গ্রামে-গঞ্জে পুনরায় মক্তব ব্যবস্থা চালু করা, যেখানে শিশুদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া হবে।

প্যান্ডেল ও ওয়াজ মাহফিলের পরিবর্তন: গভীর ইসলামি দাওয়াতি আলোচনার মাধ্যমে ধর্মীয়ভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে হবে।

২০.২ অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলা

ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্স: সুদবিহীন ঋণ প্রদান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা।

ওয়াকফ ও যাকাত ফান্ড: সমাজের ধনীদের যাকাত ও সদকা সংগঠিত করে দরিদ্র মুসলিমদের সহায়তা করা, যাতে তারা NGO-র আশ্রয় না নেয়।

বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান: টেকনিক্যাল শিক্ষা ও হালাল ব্যবসার মাধ্যমে যুব সমাজকে কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা।

২০.৩ সামাজিক উদ্যোগ ও দাওয়াতি কর্মসূচি

সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন: গ্রামের মানুষদের মধ্যে মিশনারিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিফলেট, সেমিনার, ভিডিও ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা।

জেলাভিত্তিক দাওয়াতি সংগঠন: প্রতিটি জেলায় স্থানীয় আলেম, শিক্ষক ও দাঈদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে, মিশনারিদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং পাল্টা দাওয়াতি কর্মসূচি চালানো।

ধর্মান্তরিতদের পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা (রিদ্দাহ প্রতিরোধ): যারা ভুল বুঝে বা দারিদ্র্যবশত ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, তাদের পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনতে দাওয়াতি কাজ চালানো।

২০.৪ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি ও নজরদারি

NGO নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা কঠোর করা: যে সকল NGO গোপনে বা প্রকাশ্যে ধর্মান্তরের সঙ্গে জড়িত, তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া।

বিদেশি ফান্ডের উপর নজরদারি: বিদেশি সাহায্যের ব্যবহার কোথায়, কীভাবে হচ্ছে, তা যাচাই করে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া।

শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তকে ধর্মীয় উপাদান সংরক্ষণ: শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামের মৌলিক আদর্শসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২০.৫ মিডিয়া ও সাহিত্যচর্চা

ইসলামি মূল্যবোধ প্রচারকারী নাটক, সিনেমা ও গল্প প্রকাশ: শিশু-কিশোরদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা।

ফেসবুক, ইউটিউব ও অনলাইন মিডিয়ায় দাওয়াতি কনটেন্ট: তরুণ সমাজকে প্রযুক্তি-নির্ভর ইসলামি দাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা।

অপপ্রচারের মোকাবেলায় মিডিয়া প্রতিক্রিয়া: খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, সংবাদ ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করা।

২০.৬ নারীদের বিশেষভাবে সচেতন করা

নারীর ধর্মীয় শিক্ষা নিশ্চিত করা: মেয়েদের ইসলামি শিক্ষা, হায়া, পর্দা ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।

মহিলা দাঈ গোষ্ঠী গঠন: যারা নারীদের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করবেন এবং প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা শেখাবেন।

বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির ভেতর ঢুকে খ্রিস্টান মিশনারিরা যে পরিকল্পিত প্রভাব বিস্তার করছে, তা রোধ করতে হলে চাই একযোগে ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ। ইসলামি আদর্শ অনুসরণ এবং সামাজিক ঐক্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও ঈমান রক্ষা করতে হবে। প্রত্যেক সচেতন মুসলমানের দায়িত্ব, নিজ পরিবার, সমাজ এবং দেশের ঈমানি নিরাপত্তা রক্ষা করা।

অধ্যায় ২১ : আমার স্বপ্ন – গ্রামীণ সমাজে একটি দাওয়াতি বিপ্লবের সূচনা

আমার স্বপ্ন একটি এমন মক্তব গড়ে তোলা, যা গ্রামের মানুষের জন্য শুধু কুরআন শেখার কেন্দ্র নয়, বরং পুরো এলাকার আধ্যাত্মিক অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে। এটি হবে সম্পূর্ণ দ্বীনি, দাওয়াতি এবং সমাজগঠনমূলক একটি প্রতিষ্ঠান, যা কোনওভাবেই স্কুল কিংবা মাদ্রাসার বিকল্প হবে না। বরং সমাজের ভেতর ধর্মীয় শূন্যতা পূরণ ও খ্রিস্টান মিশনারিদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে গড়ে উঠবে ইন-শা-আল্লাহ।
গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা অত্যন্ত সীমিত, বিশেষ করে নারীদের জন্য উপযোগী নিরাপদ পরিবেশ ও তরুণদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টির ঘাটতি বিদ্যমান। এমন বাস্তবতায় একটি মডেল মক্তব গড়ে তোলা সময়ের দাবি, যা শুধু একটি শিক্ষাকেন্দ্র নয় বরং একটি সামাজিক ও নৈতিক অভিভাবক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে। নিচে এমন একটি মক্তব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও কর্মপরিকল্পনা বর্ণনা করা হলো।

নারীবান্ধব ও পর্দানুশীলনভিত্তিক কাঠামো

এই প্রতিষ্ঠান হবে নারীদের পর্দা ও সম্মানের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নির্মিত। মেয়েদের জন্য আলাদা পরিসর, যেখানে থাকবে দাওয়াতি শিক্ষা, কুরআন শিক্ষার সুব্যবস্থা এবং সাপ্তাহিক তালীম। তালীমে অংশ নিতে পারবে গ্রামের শিক্ষিত মহিলারা এবং তাদের অংশগ্রহণে গড়ে উঠবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ইসলামী জ্ঞান হস্তান্তরের সেতুবন্ধ।একটি নিরাপদ ও ঘেরাও করা প্রতিষ্ঠান, যার আলাদা ব্যবস্থা থাকবে নারীদের ও পুরুষদের জন্য।

পাঠদান ও তালীম ব্যবস্থা – হৃদয় গঠনের মূল চাবিকাঠি

গ্রামীণ জনগণ কর্মজীবী হওয়ায় তাদের প্রতিদিন উপস্থিতি নিশ্চিত করা বাস্তবসম্মত নয়। তাই মক্তবের শিক্ষা কার্যক্রম সপ্তাহে দুই দিন পরিচালিত হবে:

প্রথম দিন: কুরআন তিলাওয়াত, তাজউইদ ও সহীহ উচ্চারণ শেখানো।

দ্বিতীয় দিন: আগের দিনের পাঠ অনুশীলন, শুদ্ধভাবে কুরআন পড়ার প্র্যাকটিস এবং মৌলিক আকীদা, নামাজ, রোজা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা।

২. তালীম ব্যবস্থা – নারীদের আত্মিক জাগরণ

গ্রামের ধর্মপ্রাণ নারীরা দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহী। তাই তাদের জন্য:

সাপ্তাহিক তালীম ক্লাস: শিক্ষিত নারীরা নিজেরাই বই পড়ে শুনাবে, আলোচনা করবে।

মাসিক বিশেষ তালীম: যেখানে একজন প্রাজ্ঞ আলেমা এসে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বক্তব্য রাখবেন।

তরবিয়ত ক্লাস: দ্বীনি পর্দা, দাওয়াত, সন্তান প্রতিপালন, হারাম-বর্জন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা।

৩. কিশোরী ও যুবতীদের সম্পৃক্ততা
এই শ্রেণির মেয়েরা সাধারণত কুরআন শিক্ষার আসরে আসতে চায় না। কিন্তু তালীম, গল্পভিত্তিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব, বইপড়া ও সুশৃঙ্খল পরিবেশের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

প্রতি মাসে থাকবে এক জন আলেমা দ্বারা বিশেষ নারী-তরবিয়তের আয়োজন।

*বয়স্ক পুরুষ ও তরুণদের সম্পৃক্ততা

পুরুষদের জন্য সপ্তাহে ২দিন রাতে তালীম ও কুরআন পাঠের ব্যবস্থা থাকবে। রাতের চায়ের দোকানের আড্ডা টা কুরআন শেখার আসরে পরিণত হবে ইন-শা-আল্লাহ।

পুরুষদের জন্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দাওয়াতি পরিবেশ

পুরুষদের জন্য থাকবে সম্পূর্ণ আলাদা ও সম্মানজনক কাঠামো, যেখানে একজন যোগ্য আলেম দায়িত্ব পালন করবেন। যুবকদের আকর্ষণ বাড়াতে রাতে কুরআন শিক্ষার ও তালীমের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর বড় বড় প্রোগ্রাম ও সেমিনার হবে, যেখানে থাকবে দাওয়াতি পরিবেশ, খেলাধুলার সুযোগ এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য ও ডেকোরেশন যা বাইরে থেকেও আকর্ষণ করবে।

ছয় মাস অন্তর জমকালো সেমিনার ও খেলাধুলা আয়োজন করে তাদের মক্তবমুখী করা।

কেন এই পাঠদান ও তালীম ব্যবস্থা প্রয়োজন?

১. খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে আত্মিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে – তারা গরিবদের টার্গেট করে, অথচ দ্বীনের আলো থাকলে কেউ প্রলোভনে পড়বে না।

২. নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে – গান-বাজনা, অশ্লীলতা, জেনা, মাদক থেকে বাঁচাতে হলে শিশু-কিশোর বয়সেই তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

৩. একটি বিকল্প ইসলামী জ্ঞানপুঞ্জ তৈরিতে – যেখানে মানুষ দ্বীনের আলো পাবে এবং সমাজে নেতৃত্ব দিতে পারবে।

৪. একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশ গড়তে – যেখানে ধর্মের পাশাপাশি আর্থিক ও সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থাও থাকবে।

খরচ বহনে স্বনির্ভরতা

সপ্তাহে একদিন হালকা খাবারের ব্যবস্থাও থাকবে যাতে আগ্রহ ও উৎসাহ বেড়ে যায়। তবে এ সকল কার্যক্রমের খরচ যেন দান-পত্রের উপর নির্ভর না করে—আল্লাহ যেন আমাদেরকেই তা বহন করার তৌফিক দেন। ভবিষ্যতে মক্তব হবে আত্মনির্ভর ও সামাজিকভাবে স্বচ্ছল।

পরিপূর্ণ ইসলামী পরিবেশ ও প্রকৃতি

মক্তবের প্রাণ হবে মেয়েরাই,তাই তাদের জন্য বড় পরিসরের জায়গা নিয়ে তৈরি হবে এ মক্তব। চারপাশ সম্পূর্ণ ঘেরাও করা,নিরাপদ এবং পর্দার উপযুক্ত করে তৈরি করা হবে।
তাদের জন্য গড়ে তোলা হবে একটি মনোরম, সুগন্ধিময় ও প্রাণবন্ত পরিবেশ। ফুলের গাছ, সবুজ ছায়া, ছোট হাঁস-মুরগির খামার—সবকিছু শিক্ষার্থীদের মনে একটি ইতিবাচক দাগ ফেলবে এবং তারা এই মক্তবকে নিজের বাড়ির মতো ভালোবাসবে ইন-শা-আল্লাহ। সব কিছুই থাকবে মক্তবের বেষ্টনীর ভেতরে ইন-শা-আল্লাহ। এতে শিশু থেকে বৃদ্ধা সবাই

মক্তবকে নিজের ঘরের মতো অনুভব করবে—যেখানে থাকবে আত্মিক প্রশান্তি, ভালোবাসা ও আপনত্ব।

৪. সম্প্রসারিত সামাজিক কার্যক্রম

যখন প্রতিষ্ঠানটি ভালোভাবে কার্যকর হতে শুরু করবে, তখন এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে নিচের কার্যক্রমসমূহ:

৪.১ উন্নত ফার্মেসি ও ফার্মাসিস্ট

এলাকার মানুষের জন্য বিশ্বস্ত চিকিৎসা ও ওষুধ সেবা প্রদান।

চিকিৎসার নামে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারকারী এনজিওদের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

৪.২ "কার্যে হাসানাহ ফান্ড"

যাকাত-সাদকা ভিত্তিক তহবিল যা গরিবদের সহযোগিতায় ব্যবহার হবে।

এনজিও নির্ভরতা দূর করার অন্যতম কার্যকর ব্যবস্থা।

৪.৩ যুবকদের জন্য ব্যবসায়িক উদ্যোগ

স্থানীয় পর্যায়ে হালাল ব্যবসা শেখানো ও উদ্বুদ্ধ করা।

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তরুণদের ধর্মীয়ভাবে জড়িত রাখা।

৪.৪ নারীদের কর্মসংস্থান (পূর্ণ শরয়ি পর্দাসহ)

দুস্থ মহিলাদের জন্য সেলাই, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজ শেখানোর ব্যবস্থা।

পরিপূর্ণ ইসলামি পরিবেশে আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত করা।

৫. মক্তবের সামাজিক নেতৃত্ব

এলাকাবাসীর সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে মক্তব একটি সামাজিক সিদ্ধান্ত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

স্কুল-কলেজ বা কোচিংয়ের সময় পরিবর্তনে জনগণের সম্মিলিত চাপ সৃষ্টি করে দ্বীন শিক্ষার জন্য সময় নিশ্চিত করা যাবে।

খ্রিস্টান মিশনারি ষড়যন্ত্র প্রতিহত

বর্তমানে এনজিও ও মিশনারি সংস্থাগুলো দরিদ্র গ্রামবাসীর দারিদ্র্যকে ব্যবহার করে তাদের ধর্মান্তরে উৎসাহিত করছে। আমার স্বপ্নের এই মক্তব হবে এর শক্ত জবাব। এখানে থাকবে:

কর্যে হাসানা ফান্ড, যা আর্থিক কষ্টে থাকা মানুষদের সাপোর্ট দেবে।

বিনামূল্যে ও বিশ্বাসযোগ্য ফার্মেসি, যাতে করে স্বাস্থ্যসেবার ছলে মিশনারিদের কৌশল ব্যর্থ হয়।

দ্বীনি মানদণ্ডে ব্যবসায়িক উদ্যোগ—যুবকদের জন্য হালাল জীবিকার পথ উন্মুক্ত করে মিশনারি লোভের দরজা বন্ধ করবে।

স্বচ্ছল মুসলিমদের প্রতি আহ্বান

এই উদ্যোগ শুধু আমার একার স্বপ্ন নয়। আমি চাই, যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, যারা ইসলামের জন্য কিছু করতে চান, তাদের হৃদয় কাঁপুক এই উদ্যোগে। শুধু শুধু মসজিদ-মাদ্রাসার পেছনে

টাকা খরচ করে বসে না থেকে—তারা যেন চিন্তা করেন কীভাবে একই পরিমাণ অর্থ দিয়ে দ্বীনের সওয়াবও বাড়ানো যায়, এবং ইসলামি সমাজ গঠনেও ভূমিকা রাখা যায়।

এই দাওয়াতি মক্তব হবে এক একটি ইসলামী বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। আমি স্বপ্ন দেখি, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন অসংখ্য মক্তব গড়ে উঠবে, যেখান থেকে তৈরি হবে ইসলামি আদর্শে বলীয়ান মানুষ, যারা সমাজকে রক্ষা করবে হারাম, জুলুম ও অপসংস্কৃতি থেকে।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের তৌফিক দেন এবং এ কাজে একঝাঁক মুমিন, আন্তরিক, ও স্বপ্নবাজ মানুষকে একত্র করেন। আমিন।

অধ্যায় ২২ : "একটি প্রস্তাবিত সচেতনতামূলক টিম: দান-সদকার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী খেদমতের আহ্বান”

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ হৃদয়বান, দান-সদাকার মানসিকতা রাখেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, এই দানগুলো সঠিক গন্তব্যে পৌঁছায় না অনেক সময়। অনেক অর্থ ব্যয় হয় আনপ্রোডাক্টিভ খাতে, যার দ্বারা সমাজে সত্যিকারের দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয় না, বরং লোক দেখানো কাঠামো বা লোকমুখে নামমাত্র কাজ হয়ে থাকে।

২. সচেতনতা গড়ার প্রয়োজনীয়তা

শুধু দান করলেই দায়িত্ব শেষ নয়, বরং এই দান কোথায় ব্যয় হচ্ছে তা জানা এবং তা ইসলামী কাজের পক্ষে যাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করাও একজন মুসলমানের দায়িত্ব।

আজকে বহু মুসলিম বড় অংকের অর্থ ব্যয় করছে এমন খাতে যা ইসলামের আদর্শ সমাজ গঠনের কোনো কাজে আসে না।

ফ্যাশনেবল মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ হচ্ছে, কিন্তু তার কোনো কার্যকর দাওয়াতি ফলাফল নেই।

দাওয়াত, শিক্ষা, তালীম, পুনর্বাসন, নারীদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ, কুরআন শিক্ষা, যুবকদের চরিত্র গঠন, এনজিও-প্রভাব প্রতিহত ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অর্থব্যয় হচ্ছে না।

৩. প্রস্তাবিত টিমের কাঠামো

এই টিম থাকবে একটি বিশুদ্ধভাবে দাওয়াতি টার্গেট নিয়ে।

অনলাইন ও অফলাইনে সচেতনতা তৈরি করবে—লেখা, ভিডিও, আলোচনা সভা, ইনফোগ্রাফিক্স, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে।

বিভিন্ন দান-সদাকার উৎসাহদাতা মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অর্থ সঠিকভাবে কীভাবে ইসলামের জন্য কাজে লাগানো যায় তা বুঝাবে।

টিমের মাধ্যমে প্রমাণ-ভিত্তিক রিপোর্টিং থাকবে: "আপনার দান এইভাবে কাজে লাগলো" — এই ধরণের রিপোর্ট দিয়ে মানুষকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনা হবে।

৪. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইসলামি বিপ্লবের জন্য উৎসর্গীকৃত একদল স্বপ্নবাজ, চিন্তাশীল ব্যক্তি গড়ে তোলা যারা শুধু দান নয়, বরং দানটিকে 'দাওয়াতি আমানত' হিসেবে দেখবেন।

বড় অংকের অর্থ খরচ করে শুধু বিল্ডিং না বানিয়ে বরং ইসলামি কার্যক্রমে সে অর্থ সঠিকভাবে যেন ব্যবহার হয়।

সওয়াবের পরিমাণ কিভাবে বাড়ানো যায়, সেই দিকেও মানুষকে সচেতন করে তোলা।

৫. আর্থিক সক্ষম ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বার্তা

যাদের আল্লাহ রিযিক দিয়েছেন, তাদের উচিত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা।

শুধু দান করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না, বরং সেটা ইসলামের কিসের কাজে লাগছে তা জানাও জরুরি।

অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ে না গিয়ে, একই অর্থ দিয়ে কিভাবে অধিক দ্বীনি কাজ হতে পারে, তা পরিকল্পিতভাবে করা প্রয়োজন।

৬. আহ্বান

আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন একটি টিম গঠনের আহ্বান জানাচ্ছি যারা পুরোপুরি দাওয়াতি ও পরিকল্পিত দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করবে। যারা শুধু মসজিদের দেয়ালে নাম লেখানোর জন্য দান করবেন না, বরং ইসলামী বিপ্লবের সঠিক জায়গায় তাদের টাকা ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের সাফল্য অর্জন করবেন ইন-শা-আল্লাহ।

২৩. উপসংহার

বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় বরং এটি একটি সুদূরপ্রসারী, সংগঠিত ও চতুর পরিকল্পনার অংশ, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ধর্মান্তরের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ইউরোপে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ, উপনিবেশবাদ, ও আধুনিক উন্নয়ন ধারণার আড়ালে শুরু হওয়া মিশনারি আন্দোলন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই দেশে তারা দরিদ্র, প্রান্তিক, ধর্মীয়ভাবে দুর্বল ও শিক্ষাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নারী উন্নয়নের মতো মানবিক মুখোশ পরে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চল, আদিবাসী সমাজ, নারী ও শিশু, বেকার যুবক এবং ধর্মীয় অজ্ঞ জনগণ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগিতা, এনজিও কর্মকাণ্ড ও বিদেশি সাহায্যের আড়ালে ধর্মান্তর কর্মকাণ্ড, আদিবাসী সংস্কৃতির বিলুপ্তি এবং ইসলামী সংস্কৃতির ওপর আঘাত একটি গভীর জাতীয় সংকট তৈরি করেছে। শুধু ব্যক্তি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, বরং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদেরও এ বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রাখা এখন সময়ের দাবি।

তবে এই বিপদের মোকাবেলায় কেবল অভিযোগ বা প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন সংগঠিত সচেতনতা, পরিকল্পিত দাওয়াতি কার্যক্রম, ইসলামি শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, তথ্যভিত্তিক প্রচারণা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আইনানুগ প্রতিরোধ। পরিবার, সমাজ, আলেম সমাজ, ইসলামি সংগঠন, মিডিয়া এবং সরকার—সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আজ যদি আমরা চুপ করে থাকি, উদাসীন থাকি, তবে আগামী প্রজন্মের ঈমান, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয় হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অতি প্রবল। তাই এখনই সময় নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের। আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল রেখে, সাহসিকতা ও হিকমাতের সঙ্গে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। নইলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।